

সভ্যতার ইতিহাস

[মধ্য যুগ]

গোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায়

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Textbook on History for Class VII for all schools of West Bengal and Tripura.
[Vide T.B. No. VII/H/81/25, dated 8.1.81]

সভ্যতার ইতিহাস

(মধ্যযুগ)

[সপ্তম শ্রেণীর জন্য]

শ্রীগোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায়, এম. এ.
ইতিহাসের অধ্যাপক, নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া।

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি. এ.
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ : মে, ১৯৮০
দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারী, ১৯৮১
তৃতীয় (পুনর্মুদ্রণ) সংস্করণ : মার্চ, ১৯৮১
চতুর্থ (পুনর্মুদ্রণ) সংস্করণ : মার্চ, ১৯৮৩

মূল্য : তের টাকা মাত্র।

[বাজার হইতে সংগৃহীত কাগজে মুদ্রিত]

নির্ধারিত মূল্য ব্যতীত ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ

মুদ্রাকর :
শ্রীপ্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী প্রেস
৭৩, মানিকতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

সূচীপত্র

সভ্যতার ইতিহাস (মধ্যযুগ)

প্রথম অধ্যায়

মধ্যযুগের সংজ্ঞা

সূচনা ঃ সভ্যতার ইতিহাস—বিশেষত ইওরোপের ইতিহাসে ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ঐ বৎসর জার্মান জাতির অস্ট্রোগথ শাখার নেতা ওডোয়েসার শেষ রোমান সম্রাট রোমিউলাসকে সিংহাসনচ্যুত করেন। ইহার ফলে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া গেল, রোমান সভ্যতা বিলুপ্ত হইল। বস্তুত রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পরই ইওরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগের সূচনা হয়।

৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দের গুরুত্ব

রোমান সভ্যতা ছিল নগরকেন্দ্রিক। কিন্তু নবাগত জার্মানগণ কৃষি-অর্থনীতি-নির্ভর গ্রামীণ সভাতার বাহক ছিল। স্বভাবতই তাহাদের আগমনে এবং বসতি বিস্তারের ফলে পশ্চিম ইওরোপের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। এমন কি, ইওরোপীয় ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায়ে যে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো গড়িয়া উঠিয়াছিল এই সময় তাহারও পূর্বাভাষ পরিলক্ষিত হয়। ইহা ছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপনের পর আগন্তুক জার্মান জাতিসমূহ রাষ্ট্রীয় অধিকার সংস্থাপনে উদ্যোগী হইলে নূতন নূতন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, নানা বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার ভিতর দিয়া এইরূপ ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিলেও এই সময় শিক্ষাব্যবস্থার অগ্রগতি ব্যাহত হয় নাই এবং সাংস্কৃতিক ধারাও অক্ষুণ্ণ ছিল। কারণ ইতিমধ্যে শিক্ষাদীক্ষার কেন্দ্ররূপে ইওরোপের স্থানে স্থানে কতকগুলি মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় চার্চগুলিও বেশ সুসংগঠিত ছিল।

কৃষি-অর্থনীতি—সামন্ততন্ত্রের পূর্বাভাষ

ইওরোপের ইতিহাসে যখন মধ্যযুগের সূচনা হইয়াছিল তখন ভারতে গুপ্তরাজগণ রাজত্ব করিতেন। পঞ্চম শতাব্দীতে পশ্চিম ইওরোপে হূন আক্রমণ যেমন রোমান সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করিয়াছিল সেইরূপ ভারতের

ক্ষেত্রেও শ্বেত-হূনদলের ক্রমাগত আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভারত-ইতিহাসে মধ্যযুগের সূচনা হইয়াছিল। কারণ ইতিপূর্বে ভারতের এক বিশাল অংশ গুপ্তরাজগণের শাসনে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু হূন আক্রমণের ফলে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলতার দরুন খণ্ড খণ্ড রাজ্য ও নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহ দেখা দিয়াছিল। এমন কি, ভূমি-সংক্রান্ত গতি-প্রকৃতিতেও পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল এবং ক্রমে ক্রমে গুপ্তোত্তর যুগে ভারতে সামন্ত-উপাধির বহুল প্রচলন শুরু হইয়াছিল।

ভারতে মধ্যযুগ

৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানগণ পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিল। কিন্তু কনস্টান্টিনোপলকে কেন্দ্র করিয়া পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ ছিল। অতঃপর ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অটোমান তুর্কীগণ কনস্টান্টিনোপল দখল করিলে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়াছিল। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দই হইল ইওরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগের অন্তিমকাল। ভারতের ইতিহাসেও পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে মধ্যযুগের সূচনা হইয়াছিল। আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনেকের মতে ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের মধ্যযুগের অবসান তথা আধুনিক যুগের সূচনা হইয়াছিল। কারণ ঐ বৎসর পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা দক্ষিণ ভারতের কালিকট বন্দরে নোঙ্গর করেন। ইহার ফলে ইওরোপের সহিত ভারতের সরাসরি বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। তাই ইওরোপ তথা ভারত—উভয়ক্ষেত্রেই পঞ্চম শতাব্দীতে মধ্যযুগের সূচনা এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে ঐ যুগের অবসান ঘটিয়াছিল।

ইওরোপ ও ভারত-ইতিহাসে মধ্যযুগের অন্তিমকাল

এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইতিহাসের গতি প্রবহমান স্রোতের মত নিরবচ্ছিন্ন—সুদূর অতীতকাল হইতে ইতিহাসের ক্রম-অগ্রগতির ধারায় কোন ছেদ নাই। সেইহেতু যুগ বিশেষের স্বয়ং-সম্পূর্ণতার দাবি ঐতিহাসিকগণের স্বেচ্ছাচার মাত্র। তবে আলোচনার সুবিধার জন্য ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসের কালানুক্রমিক বিভাগ করেন। সেইমত কতিপয় যুগান্তকারী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে

ইতিহাসে যুগ-বিভাগ

ইতিহাসে যুগ-বিভাগের রীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। সভ্যতার ইতিহাস প্রধানত তিনটি যুগে বিভক্ত, যথা—প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ। কিন্তু ইহা সব সময় স্মরণ রাখা দরকার যে, এক যুগ হইতে অন্য যুগে রূপান্তরের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে ধীরে ধীরে এবং পুরাতন যুগের মধ্যেই নূতন যুগের সূচনা পরিলক্ষিত হয়।

পৃথিবীর সব দেশে একই সময়ে মধ্যযুগের সূচনা হয় নাই। কারণ পরিবর্তন সমান বেগে চলে না, স্থান-কালের পার্থক্য অনুযায়ী পরিবর্তনের গতি অসমান হওয়াই স্বাভাবিক। তাই বিভিন্ন সভ্যতা ক্রমে ক্রমে বিকাশ লাভ করে। ইহার কারণ মূলত ভৌগোলিক পরিবেশের পার্থক্য।

মধ্যযুগ নামকরণের স্বার্থকতা এই যে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সহস্র বৎসরের মধ্যেই আধুনিক সভ্যতার গোড়াপত্তন হইয়াছিল। অধিকন্তু মধ্যযুগীয় সভ্যতার একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। সেই কারণে মধ্য-যুগকে উহার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী যুগ হইতে পৃথক্ ভাবে দেখা চলে। কিন্তু ইহার অর্থ ইহাই নহে যে, মধ্যযুগের একটি সুনির্দিষ্ট ধাঁচ ছিল। কারণ খুব সংক্ষিপ্তভাবে ভাগ করিলেও সহস্র বৎসর অর্থাৎ দশ শতাব্দীর ইতিহাস সময়ের দিক হইতে বড়ই দীর্ঘ। সম্ভবত এই কারণে খুব শীঘ্রই মধ্যযুগের ইতিহাসের পুনর্বিভাজনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছিল। সেইমত মধ্যযুগকে মোটামুটিভাবে তিনভাগে ভাগ করিয়া প্রথমটি 'অন্ধকার যুগ', দ্বিতীয়টি 'যথাযথ মধ্যযুগ' এবং শেষটি 'পরবর্তী মধ্যযুগ' নাম দিবার রীতি প্রবর্তিত হয়।

সুনির্দিষ্ট ধাঁচের অভাব

মধ্যযুগে ইওরোপ ও এশিয়ার ব্যাপক অঞ্চল জুড়িয়া অতি দ্রুত পট-পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। কিন্তু এই পরিবর্তনের গতি ছিল অসম ও বিভিন্ন ধরনের। এমন কি, শুধুমাত্র ইওরোপের পশ্চিম ও পূর্ব ভাগের মধ্যে পরিবর্তনের বেগে অনেক তফাত ছিল। এই কারণে মধ্যযুগে রুশ ও ফরাসীগণ পরিবর্তনের ধারা অনুযায়ী একই সময়ে সমপর্যায়ে উত্তীর্ণ হয় নাই। তাই ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত রাশিয়ায় মধ্যযুগ অব্যাহত ছিল।

অসম ও বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন

প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক ঃ

১। সভ্যতার ইতিহাসে ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দের তাৎপর্য নির্দেশ কর। ইওরোপ ও ভারত-ইতিহাসে কখন এবং কিভাবে মধ্যযুগের সূচনা হইয়াছিল ?

২। ইওরোপ ও ভারত-ইতিহাসে কখন ও কিভাবে মধ্যযুগের অবসান হইয়াছিল ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক ঃ

(ক) মধ্যযুগের আবির্ভাবে ইওরোপের সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল ?

(খ) পৃথিবীর সব দেশেই কি একই সময়ে মধ্যযুগের সূচনা হইয়াছিল ?

(গ) কোন্ শতাব্দীতে ইওরোপ ও ভারত-ইতিহাসে মধ্যযুগের সূচনা হয় এবং অবসান ঘটে।

(ঘ) কালানুক্রমিক বিভাগ বলিতে কি বুঝ ? ইতিহাসের ধারা কি বিচ্ছিন্ন ?

(ঙ) "মধ্যযুগ" নামকরণের স্বার্থকতা কি ? মধ্যযুগের কি একটি সুনির্দিষ্ট ধাঁচ ছিল ?

এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) জার্মানগণ কোন্ সভ্যতার বাহক ছিল ? (খ) ইওরোপে যখন মধ্যযুগের সূচনা হয় তখন ভারতে কাহারা রাজত্ব করিতেছিলেন ? (গ) কোন্ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়াছিল ? (ঘ) ভারত এবং ইওরোপে কোন্ শতাব্দীতে মধ্যযুগের সূচনা হইয়াছিল ?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(১) জার্মানগণ——সভ্যতার বাহক ছিল ; (২) ইওরোপের ইতিহাসে যখন মধ্যযুগের সূচনা হইয়াছিল ভারতে——রাজত্ব করিতেন ; (৩) ——সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতে মধ্যযুগের সূচনা হইয়াছিল ; (৪) ——খ্রীষ্টাব্দে ভারতে মধ্যযুগের অবসান হইয়াছিল ; (৫) ——খ্রীষ্টাব্দে অটোমান তুর্কীগণ——দখল করিলে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়াছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পশ্চিম ইওরোপে মধ্যযুগ ঃ জার্মান ও হুনজাতির আক্রমণ

সূচনা ঃ ইওরোপের ইতিহাসে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল জার্মান জাতিগুলির দ্বারা রোম সাম্রাজ্যের পশ্চিম ভাগ দখল। জার্মানগণ অবশ্য শতাব্দীকাল পূর্ব হইতেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে বসবাস শুরু করিয়াছিল। ক্রমশ তাহারা সীমান্ত অতিক্রম করিয়া রোমের সৈন্যদলে যোগ দিয়াছিল। এইভাবে জার্মান জাতির ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী রোমান সাম্রাজ্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল।



জার্মান জাতির পশ্চিম-ইওরোপের দিকে আগমন

জার্মান জাতির প্রধান দুই দল

জার্মান জাতি প্রধানত দুইটি দলে বিভক্ত ছিল। একদল ছিল পূর্ব জার্মানীর, অপর দল পশ্চিম জার্মানীর। ফ্রাঙ্ক, এঞ্জেলস, স্যাক্সন্ প্রভৃতি ছিল পশ্চিম জার্মানীর। পূর্ব জার্মানী হইতে আগত জার্মানগণ গথ, ভ্যাণ্ডাল, লম্বার্ড ও বার্গেণ্ডিয়ান নামে পরিচিত ছিল। বস্তুত পঞ্চম শতাব্দীতে জার্মান জাতির রোমান সাম্রাজ্য

আক্রমণের ক্ষেত্রে পূর্ব জার্মানীর জার্মানগণই প্রধান ভূমিকা লইয়াছিল। এইজন্য প্রথমেই গথদের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

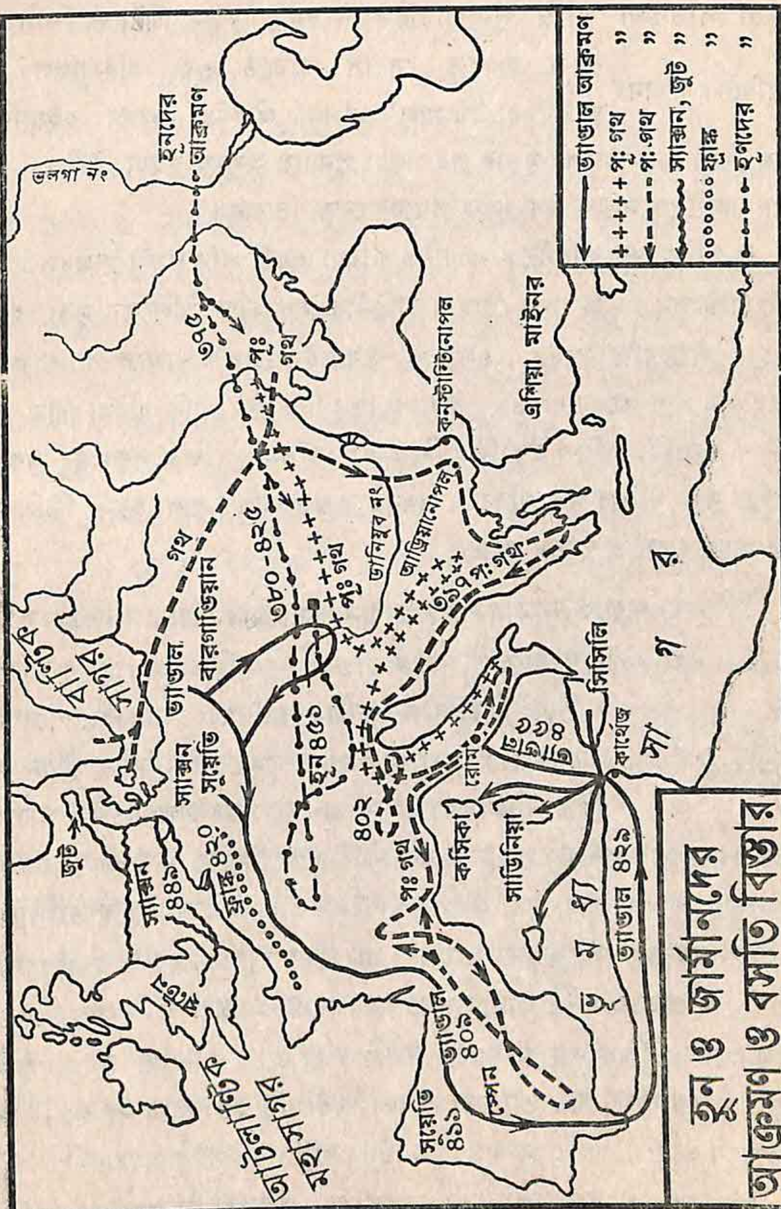
ভিসিগথ ও অস্ট্রোগথ

গথরা প্রধানত দুইটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল, যথা—ভিসিগথ এবং অস্ট্রোগথ। তাহারা প্রথমদিকে রোমান সীমান্তের নিকটস্থ অঞ্চলে বসবাস করিতেছিল এবং খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বৎসর তেমন কোন গোলযোগ সৃষ্টি করে নাই। কিন্তু অতঃপর অকস্মাৎ হূনজাতির আবির্ভাবে সমস্ত শান্তি বিঘ্নিত হইল।

হূনদের আবির্ভাব : হূনেরা মধ্য এশিয়ার স্তেপ্ তৃণভূমি অঞ্চলে বসবাস করিত। তাহারা ছিল মোঙ্গল জাতির অন্তর্গত একটি হিংস্রতর শাখা; ঘোড়ায় চড়িয়া দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করিত। নরহত্যা, অগ্নিসংযোগ বা লুণ্ঠনে তাহারা ছিল সিদ্ধহস্ত। এমন কি, তাহাদের নৈতিক চরিত্রও ছিল নিম্নমানের। ৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহাদের নিষ্ঠুর আক্রমণে অস্ট্রোগথরা পরাস্ত হইয়াছিল এবং পরবৎসর অনেক প্রচেষ্টার পর বিফল হইয়া ভিসিগথরা অত্যধিক বিচলিত ও বিভ্রান্ত হইয়া নিজেদের ত্রাণের এবং নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে রোমান সাম্রাজ্যসীমা অতিক্রম করিল।

গথশক্তির রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ ও সফলতা

সেই সময় পূর্ব এবং পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট ভেলেনস (Valens) ছিলেন খুবই দুর্বল প্রকৃতির। তিনি দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে গথদের এই অনুপ্রবেশ মানিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু স্থানীয় রাজকর্মচারীদের জুলুম ও অত্যাচারে অনুপ্রবেশকারীরা খুবই বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। এই সময় ঐ অঞ্চলে খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে গথরা উত্ত্যক্ত হইয়া থ্রেস অঞ্চলে লুণ্ঠন শুরু করিল। ইতিমধ্যে এলামনি (Alamanni) নামক জার্মান জাতির অপর এক শাখা পশ্চিমভাগ আক্রমণ করিয়াছিল। সুতরাং পশ্চিমভাগ হইতে কোনরূপ সৈন্য সাহায্য পাওয়া সম্ভব না থাকায় সম্রাট ভেলেনস স্বয়ং গথদের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু অচিরেই তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে পরাস্ত ও নিহত হইলেন। এই যুদ্ধে আড্রিয়ানোপলের যুদ্ধ (The Battle of Adrianople) নামে খ্যাত। এই প্রথম বিশ্ববিশ্রুত রোমান সৈন্য জার্মান সৈন্যদলের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত হইল।



হূন ও জার্মানদের আক্রমণ ও বসতি বিস্তার

এই ঘটনার পর পূর্ব রোমান সম্রাট থিয়োডোসিয়াস গথদের সহিত চুক্তি করিয়া সাম্রাজ্যে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। ৩৮২ খ্রীষ্টাব্দে ভিসিগথরা থ্রেস অঞ্চলে বসবাস করিতে শুরু করিয়াছিল এবং তাহাদের 'মিত্রদল' বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু থিয়োডোসিয়াসের মৃত্যুর পর গথরা পুনরায় অশান্ত হইয়া উঠিল। এই সময় এলারিক নামক এক যুবক গথদের নেতা ছিলেন।

এলারিকের উত্থান

এলারিক গথ বাহিনীকে সংগঠিত করিয়া একটি শক্তিশালী সৈন্যদল গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। অতঃপর রোমান বাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ স্টীলিকের মৃত্যু হইলে তাঁহার শক্তিবৃদ্ধি ঘটে। এলারিক তখন ইতালির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া রোম অবরোধ করেন। ৪১০ খ্রীষ্টাব্দে তিন দিন তিন রাত্রি ধরিয়া রোম লুণ্ঠন করিয়া এলারিক দক্ষিণ ইতালির দিকে ধাবিত হন। কিন্তু পরবৎসর অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে গথ অভিযান তখনকার মত স্থগিত রাখা হয়। ভিসিগথরা গল অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে।

ইতিমধ্যে অন্যান্য জার্মান জাতি রোমান সাম্রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করিতে থাকে। ৪০৬ খ্রীষ্টাব্দে ভ্যাণ্ডাল দল অন্যান্য দলের সহিত গল প্রদেশ অতিক্রম করিয়া পিরানিজে হাজির হয় এবং অতঃপর স্পেনে অনুপ্রবেশ করে। ভ্যাণ্ডালগণ প্রথমে স্পেনে বসতি স্থাপন করে, কিন্তু ভিসিগথ ও রোমান সৈন্যের যুগ্মবাহিনীর আক্রমণে ভীত হইয়া শেষ পর্যন্ত সমুদ্র অতিক্রম করিয়া আফ্রিকায় উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময় ভ্যাণ্ডালদের নেতা ছিলেন গাইসেরিক। তাঁহার নেতৃত্বে ভ্যাণ্ডালদল কার্থেজ দখলের আয়োজন করে। এই উদ্দেশ্যে প্রথমেই তাহারা স্পেনের একটি যুদ্ধ-জাহাজ দখল করিয়াছিল, অতঃপর ৪৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা কার্থেজ দখল করে। কিন্তু এই অভিযানে ভ্যাণ্ডালগণ এতই বর্বর ও নৃশংস ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল যে, তাহাদের নেতা গাইসেরিকের সুনাম নষ্ট হয়। তাই ইতিহাসে গাইসেরিক একজন ঘৃণ্য ও নিষ্ঠুর ব্যক্তি বলিয়া কুখ্যাত।

ভ্যাণ্ডাল-নেতা গাইসেরিক

ইতিমধ্যে হূনদল তাহাদের দলপতি এটিলার নেতৃত্বে পূর্ব এশিয়ার কাস্পিয়ান সাগর হইতে জার্মানীর রাইন অঞ্চল পর্যন্ত ভূভাগে অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। ৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে এটিলা

হূন-নেতা এটিলা

পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য অক্রমণ শুরু করেন। ক্রমাগত লুণ্ঠন করিয়া তিনি দানিউব অঞ্চলের দক্ষিণভাগ বিপর্যস্ত করিয়া তুলিলেন।

৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে এটিলার বাহিনী গল অক্রমণ করিলে সর্বত্র এক দারুণ ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছিল। কারণ এটিলা ছিলেন খুবই হিংস্র ও নিষ্ঠুর। ফলে রোমান সৈন্য ও জার্মান জাতির সম্মিলিত বাহিনী এটিলার বিরুদ্ধে ট্রয়েসের নিকটস্থ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল। কোন পক্ষই জয়ী না হইলেও এই যুদ্ধে রোমানদের জয় হইয়াছিল বলিয়া ধরা হয়। পরবৎসর এটিলা ইতালি অভিযান করেন। কিন্তু সমস্ত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি রোম দখল করেন নাই। কথিত আছে রোমের পোপ প্রথম লিও-র অনুরোধে তিনি রোম লুণ্ঠনের লোভ সংবরণ করিয়াছিলেন। ৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এটিলার মৃত্যু হয়। নিষ্ঠুর ধ্বংস-লীলার নায়ক হিসাবে তিনি ইতিহাসে 'ঈশ্বরের অভিশাপ' নামে কুখ্যাত।

পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের অবসান : হূন অক্রমণ প্রশমিত হইলেও রোমের বিপদ কাটিল না। ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ভ্যাণ্ডাল সৈন্য রোমে প্রবেশ করিয়া তিনি সপ্তাহব্যাপী লুণ্ঠন চালাইয়াছিল। ক্রমে রোমান সাম্রাজ্যের অবসান অনিবার্য হইয়া উঠিল, কারণ প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ এবং রোমান সম্রাটগণ ইতিমধ্যে জার্মান সৈন্যাধ্যক্ষগণের ক্রীড়নকে পরিণত হইয়াছিলেন। এমতাবস্থায় ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রোগথ সৈন্যদলের প্রধান ওডোয়েসার পশ্চিম রোমান সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া শাসন-ক্ষমতা দখল করিয়া লইলেন। ফলে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিল।

ভ্যাণ্ডাল শক্তির উত্থান

রোমান আইন ও সাম্রাজ্য-ভিত্তিক ঐক্য : রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটিলেও রোমের আইন-কানুন বিনষ্ট হয় নাই। তাই বিদেশী জার্মান জাতির আইন-কানুনের সঙ্গে সঙ্গে রোমানদের জন্য রোমের সুপ্রাচীন আইন সর্বত্র চালু ছিল। প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে যে, ইতালির রাজা থিয়োডোরিক ইতালির অধিবাসীদের জন্য রোমান আইন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন যদিও তাঁহার অস্ট্রোগথ প্রজাবৃন্দ নিজেদের সাম্প্রদায়িক-বিধি অনুযায়ীই চলিত।

রোমান সাম্রাজ্যে বিভিন্ন জাতির সমন্বয় ঘটিয়াছিল এবং এই সকল জাতির মধ্যে সাম্রাজ্য-ভিত্তিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আগন্তুক জার্মানগণ রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস করিলেও সাম্রাজ্য-ভিত্তিক ঐক্যের আদর্শ অটুট ছিল। এমন কি,

তথাকথিত অন্ধকার যুগের অবসানে যে রোমান সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (৮০০ খ্রীঃ) তাহাও অনেকাংশে প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের ভাব ও আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল।

রোমান সাম্রাজ্যের ঐক্য

জার্মান জাতির জীবনধারা : খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষে জার্মানদের আচার-ব্যবহার সম্পর্কে রোমান ঐতিহাসিক ট্যাসিটাসের বর্ণনায় উল্লেখ আছে। জার্মানদের জীবনধারায় তিনশত বৎসর পরেও তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে নাই।

জার্মানদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন খুবই প্রবল ছিল। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী বা ট্রাইবে বিভক্ত ছিল। এক-একটি গোষ্ঠী দলবদ্ধভাবে গ্রামে বাস করিত। তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন আইন ছিল। গোষ্ঠীভুক্ত কেহই স্বাধীন ছিল না, কারণ সকলের পক্ষেই গোষ্ঠীনেতার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ছিল বাধ্যতামূলক।

সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন

জার্মানগণ প্রকৃতি ও পূর্বপুরুষদের উপাসনা করিত। তাহাদের মধ্যে বহু দেবতার আরাধনা প্রচলিত ছিল। বস্তুত তাহাদের দেবতাদিগের নাম হইতেই ইংরাজী দিনগুলির নামকরণ হইয়াছিল ; ওডেন হইতে ওয়েনেস ডে, থর (Thor) হইতে থার্সডে, ফ্রিগা (Frigga) হইতে ফ্রাইডে ইত্যাদি।

ধর্ম

জার্মান জাতির বসতি বিস্তার : রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পূর্বেই জার্মান জাতির বিভিন্ন শাখা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং পঞ্চম শতাব্দীর শেষাংশে অস্ট্রোগথরা ইতালিতে, ভ্যাণ্ডালগণ উত্তর আফ্রিকায়, ভিসিগথরা স্পেন ও গলদেশের দক্ষিণাংশে, বার্গেণ্ডিয়ানগণ রোমের উপত্যকা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। ইহা ছাড়া ফ্রাঙ্কজাতির অন্যতম শাখা স্যালিয়ান ফ্রাঙ্ক গলদেশের মধ্য ও উত্তর ভাগ দখল করিয়া একটি রাজ্য স্থাপন করে। এদিকে এই সময় ডেনমার্ক হইতে জুটেরা এবং জার্মানী হইতে এংগেল ও স্যাক্সনগণ বৃটেনে আসিয়া বসতি স্থাপন করে।

খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব : জার্মান জাতির মধ্যে ফ্রাঙ্ক ও স্যাক্সন্ শাখা ভিন্ন অপরাপর সকলেই রোমান সাম্রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিবার পূর্বেই খ্রীষ্টধর্ম

গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের বিরোধী এরিয়ান সম্প্রদায় কর্তৃক ধর্মান্তরিত হইয়াছিল। ইহার ফলে উহাদের পক্ষে রোমানদের সহিত মেলামেশার ক্ষেত্রে অনেক বাধা ছিল। কিন্তু অতঃপর জার্মানদের অন্যতম শাখা ফ্রাঙ্কদের রাজা ক্লোভিস রোমান ক্যাথলিক ধর্মে ধর্মান্তরিত হন। ফলে রোমানদের সহিত সংমিশ্রণের ক্ষেত্র প্রসারিত হইয়াছিল। কালক্রমে জার্মানদের সহিত রোমানদের সংমিশ্রণের ফলে মধ্যযুগের ইওরোপে মিশ্র-সভ্যতার জন্ম হইয়াছিল।

রোমান-জার্মান সংমিশ্রণ; মিশ্র-সভ্যতার জন্ম

প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক :

১। আড্রিয়ানোপলের যুদ্ধ পর্যন্ত রোমান সাম্রাজ্যে জার্মান জাতির অনুপ্রবেশ সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

২। এটিলার নেতৃত্বে হূনদের রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ-কাহিনী বর্ণনা কর।

৩। জার্মান জাতির জীবনধারা সম্পর্কে আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক :

(ক) জার্মান জাতি প্রধানত কয়ভাগে বিভক্ত ছিল? কি কারণে আড্রিয়ানোপলের যুদ্ধ হইয়াছিল?

(খ) এলারিক কোন্ দলের নেতা ছিলেন? তিনি কখন ও কিভাবে রোম আক্রমণ করিয়াছিলেন?

(গ) ভ্যাণ্ডালদলের নেতার নাম কি ছিল? তিনি কোন্ রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন?

(ঘ) কখন ও কিভাবে শেষ রোমান সম্রাটের পতন হইয়াছিল?

(ঙ) রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর রোমের আইন ও সাম্রাজ্য-ভিত্তিক ঐক্যের আদর্শ কিভাবে অক্ষুণ্ণ ছিল?

(চ) জার্মানদের ধর্মীয় বিশ্বাস কিরূপ ছিল?

(ছ) রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর জার্মান জাতিসমূহ কে কোন্ রাজ্যে বসতি-বিস্তার করিয়াছিল?

(জ) কিভাবে রোমান ও জার্মানদের সংমিশ্রণ ও সমন্বয় ঘটিয়াছিল?

এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(১) গথেরা কয়টি দলে বিভক্ত ছিল এবং তাহারা কি কি নামে অভিহিত হইত? (২) গথদের নেতার নাম কি ছিল? (৩) কাহাদের মধ্যে আড্রিয়ানোপলের যুদ্ধ হইয়াছিল? (৪) গাইসেরিক কোন্ দলের নেতা ছিলেন? (৫) কাহাকে 'ঈশ্বরের অভিশাপ' বলিয়া অভিহিত করা হয়? (৬) কোন্ কোন্ দেবতার নাম হইতে ওয়েনেস-ডে, থার্স-ডে এবং ফ্রাই-ডে প্রভৃতি ইংরাজী দিনের নামকরণ হইয়াছিল?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(১) জার্মান জাতি প্রধানত — দলে বিভক্ত; (২) হূনেরা — অঞ্চলে বসবাস করিত; (৩) আড্রিয়ানোপলের যুদ্ধের সময় রোমান সম্রাট ছিলেন —; (৪) রোমান সৈন্যবাহিনীর প্রধান — মৃত্যু হইলে এলারিকের শক্তিবৃদ্ধি হইয়াছিল; (৫) কথিত আছে রোমের পোপ লিও'র অনুরোধে — রোম লুণ্ঠনের লোভ ত্যাগ করিয়াছিলেন; (৬) ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রোগথ সৈন্যদলের প্রধান — পশ্চিম রোমান সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করেন; (৭) জার্মানদের মধ্যে — বন্ধন খুবই প্রবল ছিল; (৮) ওডেন হইতে —, থর হইতে —, ফ্রিগা হইতে — ইত্যাদি ইংরাজী দিনগুলির নামকরণ হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

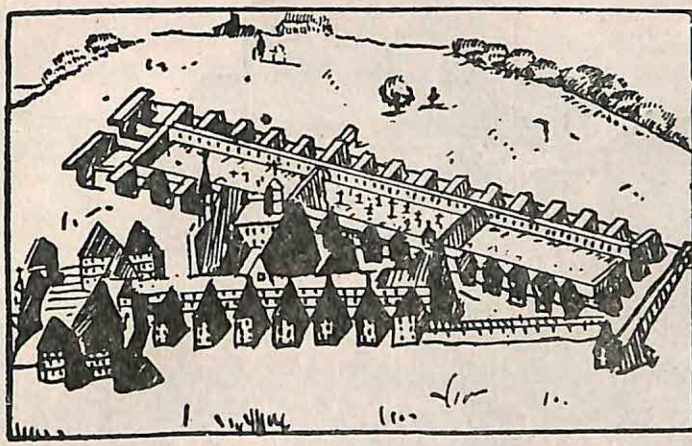
তথাকথিত "অন্ধকার যুগ"

সূচনা ঃ রোমান সভ্যতার সাংস্কৃতিক অগ্রগতি এবং পক্ষান্তরে জার্মান জাতির আদিমতা, বর্বরতা প্রভৃতি ইতিহাসে সুবিদিত। তাই খ্রীষ্টীয় চতুর্থ হইতে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত দীর্ঘ তিনশত বৎসরকাল সময় "অন্ধকার যুগ" নামে কুখ্যাত। ইহার কারণ হিসাবে বলা হয় যে, রোমান সাম্রাজ্যে আগন্তুক জার্মানগণ রোমান সভ্যতা বলিতে যাহা বুঝাইত তাহা ধ্বংস করিয়াছিল। বড় বড় শহরে অগ্নিসংযোগ করিয়াছিল এবং পুঁথিপত্র যাহা পাইয়াছিল তাহা বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহাদের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে পশ্চিম ইওরোপের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার সৃষ্টি হইয়াছিল।

জার্মান আক্রমণ ও অরাজকতা

এই প্রসঙ্গে ইহা প্রথমেই উল্লেখযোগ্য যে, তথাকথিত "অন্ধকার যুগ" আখ্যাটি দীর্ঘদিন ধরিয়া প্রচলিত একটি অনৈতিহাসিক ধারণামাত্র। জার্মান জাতির লোকেরা স্বভাবতই বর্বর, অসভ্য ছিল বা তাহারা রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর ছিল বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। কারণ ইতিমধ্যে তাহাদের মধ্যে অনেকেই খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল এবং রাজ্যজয় করিয়া ক্রমশ সভ্য হইয়া উঠিতেছিল। ইহা ছাড়া জার্মানদের অন্যতম

অনৈতিহাসিক ধারণা—রাজা থিয়োডোরিক, খ্রীষ্টীয় মঠ, গীর্জা



মঠ

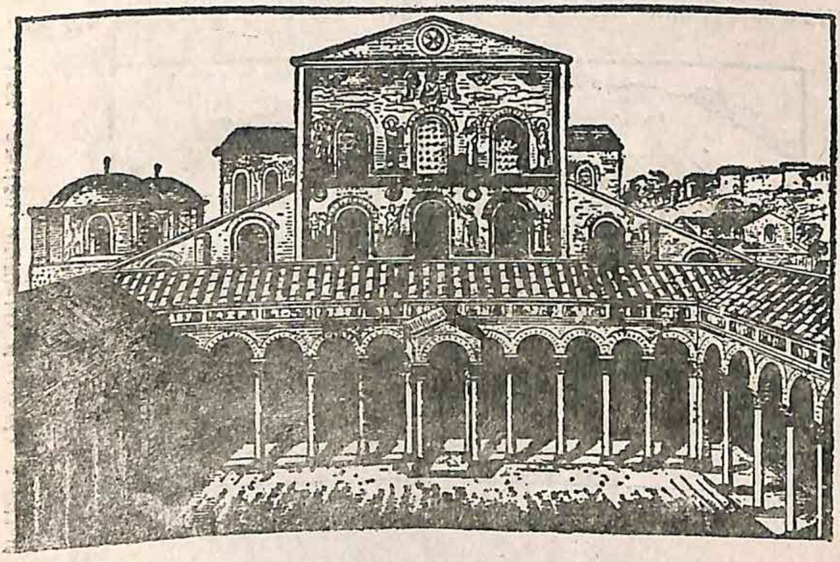
শাখা অস্ট্রোগথদের রাজা থিয়োডোরিক রোম নগরীর পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সর্বোপরি এই সময় বহু মূল্যবান প্রাচীন পুঁথিপত্রের সংরক্ষণ এবং সমাজব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক ধারা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ধর্মীয় মঠ ও গীর্জাগুলির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

খ্রীষ্টধর্মের উত্থানের পূর্বেই ইওরোপে অনেকগুলি মঠ ছিল। কিন্তু পশ্চিম ইওরোপে মঠ গঠন ও মঠগুলির সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সন্ত বেনেডিক্টের নাম সর্বাগ্রগণ্য। মঠবাসীদের জন্য কতকগুলি সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী প্রণয়ন ও প্রবর্তন করিয়া তিনি অশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কখনই মঠগুলিকে শিক্ষাদীক্ষার কেন্দ্রে পরিণত করিতে চাহেন নাই। বস্তুত বেনেডিক্টের অন্যতম অনুগামী

বেনেডিক্ট ও ক্যাসিডোরাস

ক্যাসিডোরাস মঠে পুঁথিপত্র সংরক্ষণ ও গ্রন্থাগার স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত স্কুইলেসের মঠে ল্যাটিন সাহিত্যের অনেক মূল্যবান প্রাচীন পুঁথিপত্র উদ্ধার ও নকল করিবার চেষ্টা হয়।

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের যুগে খ্রীষ্টধর্ম ক্রমাগত শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল। প্রথমদিকে রোমান সম্রাটগণ এই ধর্মের প্রতি বিরূপ ছিলেন। কারণ সম্রাট ও শাসকগণ মনে করিতেন যে, খ্রীষ্টধর্মের হোতাগণ রাষ্ট্রের মধ্যে



সেণ্ট পিটার্স গীর্জা—রোম

রাষ্ট্রগঠনে বদ্ধপরিকর। ফলে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচার চলিয়াছিল। কিন্তু অত্যাচার সত্ত্বেও খ্রীষ্টধর্ম ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে রোমান সম্রাট কনস্টানটাইন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলে খ্রীষ্টীয় সংগঠন বা গীর্জাগুলি রাষ্ট্রীয় চার্চের মর্যাদা অর্জন করিয়াছিল। অতঃপর খ্রীষ্টধর্মের ক্রমাগত প্রসার ঘটিতে থাকে এবং রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবার পূর্বেই গীর্জাগুলি বেশ বড় হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কি, ইহার সংগঠনে, পোশাক-পরিচ্ছদে এবং সর্বোপরি ইহার অনুষ্ঠান প্রভৃতিতেও রোমান সাম্রাজ্যের আদর্শের প্রতিফলন পরিলক্ষিত

খ্রীষ্টধর্মের প্রসার ও সংগঠন

হইত। সাম্রাজ্যের অনুকরণে গীর্জাগুলির প্রশাসনিক কাঠামোও গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইতিমধ্যে নানা উপায়ে দান গ্রহণ করিয়া ইহা অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল, কিন্তু সেই অর্থের অধিকাংশই দান-ধ্যান করিয়াই ব্যয় হইত। ইহাতে সকলের মনেই গীর্জাগুলির প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত হইয়াছিল। এমন কি, আগন্তুক জার্মান জাতির লোকজনও অনেক ক্ষেত্রে গীর্জাগুলি অটুট রাখিয়া ধ্বংসলীলা চালাইয়াছিল। সেইহেতু রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণের ফলে যখন সাম্রাজ্যের অসামরিক শাসকবর্গ তথা ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিতাড়িত হইয়াছিল সেই সময় চার্চগুলির বিশপ ও পুরোহিতগণ যে যেখানে ছিলেন সে সেখানেই রহিলেন। বস্তুত অখণ্ড রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর রোমান গীর্জাই ছিল একমাত্র সংগঠন যাহার কাঠামোর সহিত রোমান সাম্রাজ্যের সংগঠনের তুলনা করা চলে।

অতএব খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষার্ধে রোমের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িলেও গীর্জাগুলির প্রশাসন ও কাজকর্ম অটুট ছিল। ইহা ছাড়া বিভিন্ন স্থানে গীর্জাগুলির প্রধানদের নেতৃত্বে আঞ্চলিক প্রতিরোধ ব্যবস্থাও সুদৃঢ় করা হইয়াছিল। এই সকল কারণে রোমের বিশপের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতেছিল। খ্রীষ্টধর্মের অনুশাসন রচনার ক্ষেত্রেও বলিষ্ঠ নীতি নির্ধারণের রীতি গ্রহণ করা হইয়াছিল। খ্রীষ্টধর্মের অনুশাসনে তখন সমাজব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হইত। এমন কি, নাগরিক জীবনের দৈনন্দিন আচার-ব্যবহারেও ধর্মের প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট।

প্রশাসন ও আঞ্চলিক প্রতিরোধ গঠন

প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক :

১। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ হইতে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত সময়কাল কি যথার্থভাবে 'অন্ধকার যুগ' ছিল? অন্ধকার যুগের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন কর।

২। সুপ্রাচীন সভ্যতা সংরক্ষণে এবং সমাজব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক ধারা নিয়ন্ত্রণে ধর্মীয় মঠ ও গীর্জার ভূমিকা আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক ঃ

(ক) প্রথমদিকে রোমান সম্রাটগণ কেন খ্রীষ্টধর্মের প্রতি বিরূপ ছিলেন? (খ) জার্মান জাতি কি প্রকৃতই বর্বর ছিল? কিভাবে রোমান সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টধর্ম স্বীকৃতি পাইয়াছিল? (গ) কি কারণে গীর্জাগুলির প্রতি সকলের শ্রদ্ধা জাগ্রত হইয়াছিল? (ঘ) খ্রীষ্টধর্মের অনুশাসনসমূহ কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল?

এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(১) ইওরোপের ইতিহাসের কোন্ সময়কে 'অন্ধকার যুগ' নাম দেওয়া হইয়াছিল? (২) পশ্চিম ইওরোপে মঠ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কাহার নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়? (৩) ক্যাসিডোরাস কে ছিলেন?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(১) অস্ট্রোগথদের রাজা — রোম নগরীর পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। (২) পশ্চিম ইওরোপে মঠ গঠন ও মঠগুলির সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে — নাম সর্বাগ্রগণ্য।

চতুর্থ অধ্যায়

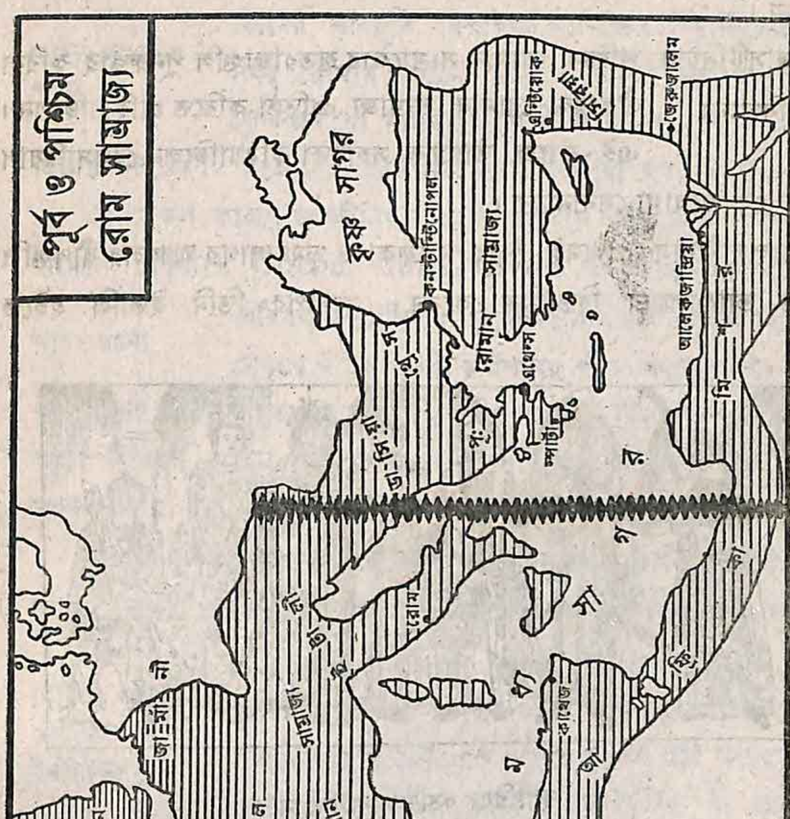
বাইজানটাইন সভ্যতা

সূচনা ঃ রোমান সাম্রাজ্য কালক্রমে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে— পশ্চিম ভাগের রাজধানী ছিল রোম এবং পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী হইল কনস্টান্টিনোপল। ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে রোমের সুবিখ্যাত সম্রাট কনস্টানটাইন বসফোরাস প্রণালীর দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত সুপ্রাচীন বাইজানসিয়াম নগরীতে রোমান সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রাজধানী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাইজানসিয়ামের নূতন নামকরণ হইল কনস্টান্টিনোপল।

কনস্টান্টি-নোপলের উত্থান

সম্রাট কনস্টানটাইন কিন্তু নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি স্বয়ং খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ফলে খ্রীষ্টধর্ম পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত হইয়াছিল।

জাস্‌টিনিয়ান (৫২৭-৫৬৫ খ্রীঃ) : পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাটদিগের মধ্যে জাস্‌টিনিয়ানের নাম অবিস্মরণীয়। ৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পূর্ব রোমান



সম্রাট হন। তাঁহারসংহাসন আরোহণকালে সাম্রাজ্যের কোষাগার পরিপূর্ণ ছিল, উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি সুরক্ষিত সীমান্ত ও সুসংগঠিত সৈন্যদলের সহায়তা পাইয়াছিলেন। তাঁহার উচ্চাভিলাষ

পূর্ব রোমান সম্রাট

ছিল এবং তিনি ছিলেন বিচক্ষণ ও অক্লান্তকর্মী। জনৈক সভাসদের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ছিলেন এমন একজন সম্রাট যাহার চোখে ঘুম ছিল না।

জাস্টিনিয়ানের লক্ষ্য

জাস্টিনিয়ান পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের হৃতরাজ্যগুলি পুনরুদ্ধার করিয়া ঐক্যবদ্ধ রোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। এই কাজে তাঁহাকে সহায়তা করিয়াছিলেন বেলসারিয়াস নামক এক সুযোগ্য সেনানায়ক।

বেলসারিয়াস প্রথমেই উত্তর আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের দ্বীপগুলি হইতে ভ্যাণ্ডালদের বিতাড়িত করেন। অতঃপর তিনি ইতালি হইতে



সপারিষদ সম্রাট জাস্টিনিয়ান

অস্ট্রোগথদের বহিষ্কার করিতে চাহিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি সাময়িক সাফল্য অর্জন করেন। কারণ উহাদের পরাজিত করিয়া যখন তিনি পারস্য অভিযানে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, তখন অস্ট্রোগথরা পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং ইতালি উহাদের দখলে চলিয়া গেল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ইতালিতে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া জাস্টিনিয়ান স্পেনের ভিসিগথ রাজ্যের দক্ষিণাংশ জয় করিতে চাহিয়াছিলেন এবং এক্ষেত্রে তিনি সফলও হইয়াছিলেন। জাস্টিনিয়ান পারস্যের সঙ্গে এক সুদীর্ঘ যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

জাস্‌টিনিয়ানের আইন ঃ জাস্‌টিনিয়ান কিন্তু শুধুমাত্র রাজ্যজয়ের মাধ্যমেই রোমান সাম্রাজ্যের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করিতে চাহেন নাই—তিনি প্রাচীন রোমের ভাবমূর্তি ফিরাইয়া আনিতে চাহিয়াছিলেন। এই সময় রোমান আইনের জটিলতা ও বিশালতা হেতু আইনজ্ঞ লোকজন বা ম্যাজিস্ট্রেটগণ ঐ আইন প্রয়োগ করিতে গিয়া বিভ্রান্ত হইতেন। ফলে বিচারের ক্ষেত্রে নানা অসুবিধা দেখা দিয়াছিল।

আইন-প্রণয়নের কারণ

এই সকল কারণে জাস্‌টিনিয়ান আইন-প্রণয়নে ব্রতী হন। ফলে তাঁহার আমলে সুবিখ্যাত Corpus Juris Civilis বা জাস্‌টিনিয়ানের আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। ট্রিবোনিয়ান নামক একজন বিশেষজ্ঞের নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিশনের পাঁচ বৎসরব্যাপী প্রচেষ্টার ফলেই এই আইন রচিত হইয়াছিল। সমগ্র আইনটি তিন অংশে বিভক্ত ছিল, যথা—বিধিবদ্ধ আইন, আইনের সংক্ষিপ্তসার বা ডাইজেস্ট এবং আইনের সহজ-পাঠ বা ইনস্টিটিউশন।

আইন রচনা

রোমে দীর্ঘকাল যাবৎ প্রচলিত আইনসমূহের সংকলন করিয়াই বিধিবদ্ধ আইন তৈয়ারী হইলেও ঐ আইনের অপ্রচলিত অংশসমূহ বাদ দিয়া গ্রহণ করা হইয়াছিল। বিধিবদ্ধ আইন ছাড়াও রোমের অভিজ্ঞ আইনবিশারদ্‌গণ আইন-ঘটিত গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল প্রশ্নের উত্তরদানের মাধ্যমে এক ধরনের আইন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেইগুলি সংকলন করিয়াই ডাইজেস্ট বা সংক্ষিপ্তসার রচিত হয়। এক্ষণে এই সমুদয় আইনকে ছাত্রোপযোগী করিয়া পুস্তকাকারে লেখা হইয়াছিল এবং ইহার ইনস্টিটিউশন নাম দেওয়া হয়। অধিকন্তু আইনের অসঙ্গতি দূর করিবার জন্য পুস্তিকা প্রকাশিত হইত এবং তাহা নভেলস্‌ নামে পরিচিত ছিল।

বিবিবদ্ধ আইন, ডাইজেস্ট ও ইনস্টিটিউশন

আইন প্রণেতা হিসাবে জাস্‌টিনিয়ানের নাম বর্তমানেও স্মরণ করা হয়। কারণ, ইহা ছিল তাঁহার এক অক্ষয় কীর্তি। এই আইনের গুরুত্ব ছিল এই যে, ইহা প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দিয়াছিল। রোমান আইন হঠাৎ উদ্ভূত হয় নাই, সামাজিক ক্রম-অগ্রগতি ও পরিবর্তনের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া ইহা গড়িয়া উঠিয়াছিল।

গুরুত্ব

স্থাপত্য ও চিত্রশিল্প ঃ সম্রাট জাস্‌টিনিয়ান স্থাপত্য ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজদরবারে সৌন্দর্য ও জাঁকজমকের অন্ত ছিল না। রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের রাজপ্রাসাদের সুবর্ণময় বৃক্ষ, মণিমুক্তাখচিত ফুল, সোনার পাখী প্রভৃতি আলংকারিক কারুকার্যাদি বাইজানটাইন স্থাপত্য-শিল্পের বিস্ময়কর সৃষ্টি। রাজত্বের সূচনায় জাস্‌টিনিয়ান সার্জিয়াস ও বাচ্চাস নামে দুইটি গীর্জা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই গীর্জাগুলির গম্বুজ নির্মাণকার্যে



সেণ্ট সোফিয়া গীর্জা

বাইজানটাইন শিল্পিগণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। জাস্‌টিনিয়ান ইতালিতেও রাজপ্রাসাদ ও গীর্জা নির্মাণ করাইয়া ইতালির রাজা থিয়োডোরিকের স্থাপত্যকীর্তিকে ম্লান করিয়া দিয়াছিলেন। তবে বাইজানটাইন স্থাপত্যবিদ্যার চরম প্রকাশ বলিতে সেণ্ট সোফিয়া গীর্জার কথা উল্লেখ করা যায়। এমন কি, বাইজানটাইন শিল্পিগণ ইহাকে গীর্জা নির্মাণের ক্ষেত্রে আদর্শ বলিয়া মনে করিতেন।

জাস্‌টিনিয়ানের আমলে চিত্রশিল্পের যথেষ্ট প্রসার ঘটে এবং প্রতিকৃতি অঙ্কন জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইহা ছাড়া চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে মোজেইকের বহুল ব্যবহার বাইজানটাইন চিত্রশিল্পের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। উল্লেখযোগ্য চিত্রগুলির

মধ্যে সপারিষদ সম্রাট জাস্টিনিয়ান ও সাম্রাজ্ঞী থিয়োডোরার মোজেইক অবিস্মরণীয়।

ব্যবসায়-বাণিজ্য ঃ বাইজানটাইন সভ্যতার যুগে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। নৌ-বহরের সাহায্যেই এই বাণিজ্যের বিশেষ প্রসার ঘটিয়াছিল। বাইজানটাইনের অধিবাসিগণ সমুদ্রপথে আবিসিনিয়া, সিংহল ও চীনের সহিত ব্যবসায়িক যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিল। আবিসিনিয়া হইতে গজদন্ত দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাদি এবং সিংহল হইতে মূল্যবান প্রস্তর, ঔষধ, সুগন্ধি মসলা ও বস্ত্রাদি আমদানি করা হইত। ইহা ছাড়া ক্রিমিয়া অঞ্চলের মধ্য দিয়া রাশিয়ার সহিতও বাণিজ্যিক লেনদেন চালু ছিল।

চীন, আবিসিনিয়া ও সিংহলের সহিত বাণিজ্য

শিল্প ঃ বাইজানটাইন সভ্যতায় নানাধরনের শিল্পকর্মের উল্লেখ পাওয়া যায়। শিল্পিগণ কাচশিল্প, কারুশিল্প ও মিনার কাজে পরদর্শী ছিলেন। ঐ সকল শিল্পদ্রব্যের ইওরোপের বাজারে যথেষ্ট চাহিদা ছিল। ইহা ছাড়া বাইজানটাইনের শিল্পিগণ স্বর্ণ ও রৌপ্যের কারুকার্যে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল। মোজেইক ও চীনামাটির কাজেও তাহাদের খ্যাতি ছিল।

বাইজানটাইন সংস্কৃতি ঃ বাইজানটাইন সভ্যতা ছিল মূলতঃ গ্রীক সভ্যতা, যদিও ঐ সভ্যতার বিকাশে নিকট প্রাচ্য, সিরিয়া, পারস্য, মিশর প্রভৃতি বিভিন্ন আঞ্চলিক সভ্যতার সমন্বয় ও প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদির মধ্যে বাইবেল ও গ্রীক চার্চের যাজকদের লিখিত গ্রন্থাদি চর্চার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইত। এই সময় গ্রীক সাহিত্যের যথেষ্ট চর্চা ছিল এবং গ্রীক ভাষায় লিখিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাদির পাণ্ডুলিপির নকল রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। গ্রীক কাব্যেরও সমাদর ছিল। ইহা ছাড়া ইতিহাস, ঈশ্বরতত্ত্ব এবং ব্যক্তিগত পত্রালাপের মাধ্যমে গ্রীক ভাষা চর্চার ফলে বাইজানটাইন সাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, বাইজানটাইন সভ্যতার সহিত সংশ্লিষ্ট সাহিত্যিকগণ বড় বেশী অনুকরণপ্রবণ ছিলেন। গ্রীক ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ রচনাদি অনুকরণ

মূলতঃ গ্রীক সভ্যতা

করিয়াই তাঁহারা গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন। ফলে সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁহাদের কোন নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় না।

দর্শন

বাইজানটাইনে ঈশ্বরতত্ত্ব ও দর্শন চর্চা হইত। কিন্তু গ্রীক দর্শনের তেমন কদর ছিল না। প্রসিদ্ধ দার্শনিকদের মধ্যে লিওনটিয়াস ও প্রকোপিয়াস বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

বাইজানটাইনে বিজ্ঞান

বাইজানটাইনে বিজ্ঞান চর্চারও ব্যবস্থা ছিল। তাহারা নলের সাহায্যে শত্রুদের বিরুদ্ধে দাহ্য বস্তু (Greek fire) নিক্ষেপের কৌশল আয়ত্ত করিয়াছিল। গ্রীস ও প্রাচ্যদেশের বিজ্ঞান-বিষয়ক যাবতীয় পাণ্ডুলিপি বাইজানটাইনের গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের সুবন্দোবস্ত ছিল।

প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক :

১। সম্রাট জাস্টিনিয়ান কে ছিলেন ? তাঁহার লক্ষ্য ও রাজ্যজয় বর্ণনা কর।

২। জাস্টিনিয়ানের আইন বলিতে কি বুঝ ? এই আইনের বিভিন্ন দিক ও গুরুত্ব আলোচনা কর।

৩। জাস্টিনিয়ানের আমলে স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পের উন্নতি সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৪। বাইজানটাইন সভ্যতার যুগে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প সম্পর্কে আলোচনা কর।

৫। বাইজানটাইন সভ্যতায় সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের বিকাশ সম্পর্কে কি জান ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক :

(ক) বিভক্ত রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানীদ্বয়ের নাম কি ছিল ? (খ) কনস্টান্টাইন কে ছিলেন এবং তিনি কোথায় নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন ? (গ) জাস্টিনিয়ান কখন সিংহাসন আরোহণ করেন এবং তিনি কোন্ রাজ্যসমূহ পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ? (ঘ) কি কারণে জাস্টিনিয়ান আইন-প্রণয়নে ব্রতী হইয়াছিলেন ? (ঙ) কোন্ বিশেষজ্ঞের নেতৃত্বে জাস্টিনিয়ানের আইন রচিত হইয়াছিল এবং ঐ আইনের বিভিন্ন অংশের কি নামকরণ হইয়াছিল ? (চ) বাইজানটাইন সভ্যতার যুগে স্থাপত্যের নিদর্শন কি কি ছিল ? (ছ) বাইজানটাইন সভ্যতার যুগে সমুদ্রপথে কোন্ কোন্ দেশের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল ? (জ) বাইজানটাইন সভ্যতার দুইজন প্রসিদ্ধ দার্শনিকের নাম লিখ।

এক কথায় উত্তর দাও :

(১) কোন্ প্রাচীন নগরীতে রোমান সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল ? (২) বেলসেরিয়াস কে ছিলেন ? (৩) জাস্টিনিয়ান প্রণিত আইনের নাম কি ছিল ? (৪) ইনস্টিটিউশন বলিতে কি বুঝ ? (৫) বাইজানটাইন সভ্যতার শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন কি ? (৬) বাইজানটাইনের ব্যবসায়িগণ আবিসিনিয়া ও সিংহল হইতে কি কি দ্রব্য আমদানি করিত ? (৭) বাইজানটাইন সভ্যতায় কোন্ কোন্ সভ্যতার প্রভাব ছিল ?

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। —— খ্রীষ্টাব্দে রোমান সম্রাট —— বাইজানসিয়াম নগরীতে রোমান সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন ; ২। বাইজানসিয়ামের নামকরণ হইয়াছিল — ; ৩। জাস্টিনিয়ানের সুযোগ্য সেনানায়ক ছিলেন —— ; ৪। — নামক একজন বিশেষজ্ঞের নেতৃত্বে গঠিত কমিশনের মাধ্যমে জাস্টিনিয়ানের আইন রচিত হয় ; ৫। জাস্টিয়ানের আইন তিন অংশে বিভক্ত যথা —— ; ৬। রাজত্বের শুরুতে জাস্টিনিয়ান —— ও —— নামে দুইটি গীর্জা নির্মাণ করাইয়াছিলেন ; ৭। বাইজানটাইন আমলে উল্লেখযোগ্য চিত্রগুলির মধ্যে — ও — মোজেইক অবিস্মরণীয় ; ৮। বাইজানটাইন সভ্যতার সহিত সংশ্লিষ্ট —— বড় বেশী অনুকরণ-প্রবণ ছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলাম ধর্মের উত্থান ও মুসলমান শক্তি

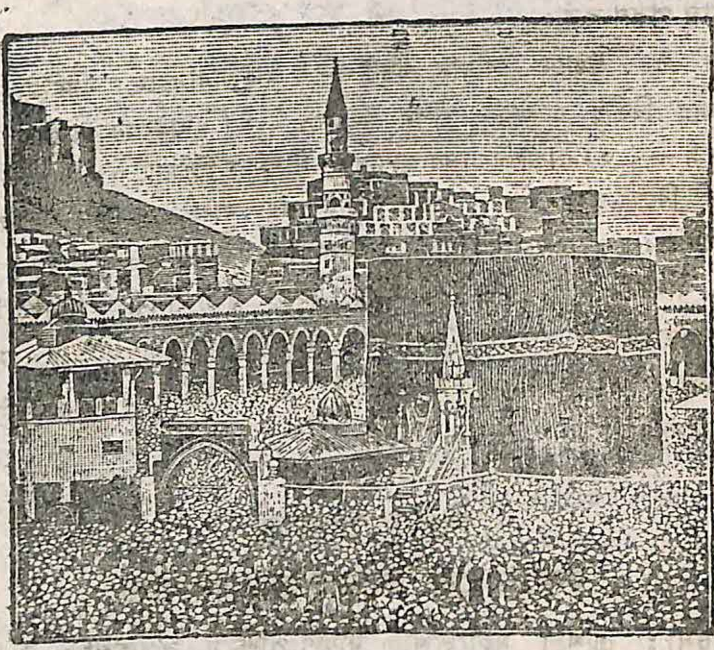
সূচনা : এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে কতকগুলি উপদ্বীপের সমাবেশে আরবদেশের অবস্থান। ইহার উত্তর-পশ্চিমে সিরিয়া এবং উত্তর-পূর্বে সুপ্রসিদ্ধ টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস উপত্যকাদ্বয়। লোহিতসাগর, ভূমধ্যসাগর ও ভারত মহাসাগর আরবের প্রান্তদেশ স্পর্শ করিয়াছে।

শুষ্ক মরুভূমি—যাযাবর জীবন

আরবের অধিকাংশ এলাকা বৃষ্টির অভাবে শুষ্ক। ফলে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া মরুভূমি গড়িয়া উঠিয়াছে। আবহাওয়া শুষ্ক ও উত্তপ্ত, নদীজল তথা জলাশয়ের বড়ই অভাব। কৃষিকার্য সম্ভব নয় বলিয়া আরবের লোকজন বেদুইন (যাযাবর) জীবন যাপন করিত। তাহারা তাঁবুতে বসবাস করিত, মেষ পালন করিত এবং

তৃণভূমি ও খাদ্যের সন্ধানে একস্থান হইতে অন্যস্থান ঘুরিয়া বেড়াইত। আরবের পূর্ব ও পশ্চিমে সমুদ্র উপকূলে কিছু সমৃদ্ধ এলাকাকে কেন্দ্র করিয়া শহরের উৎপত্তি হইয়াছিল এবং সেখানের আরবগণ স্থায়ী জীবন যাপন করিত।

পরিবা বা গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করিয়া আরবদের রাজনৈতিক জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রত্যেক গোষ্ঠীর প্রধানগণ 'শেখ' উপাধি লইতেন। তাঁহাদের আদেশ বাধ্যতামূলক ছিল।



কাবা মসজিদ

মক্কা—কাবা মসজিদ

আরবদের প্রধান বাজারের নাম ছিল মক্কা। আবার মক্কা ছিল তাহাদের পীঠস্থান, কারণ সেখানেই ছিল তাহাদের পবিত্র কাবা মসজিদ। ইসলাম মতে এই মসজিদ পৃথিবীতে সর্বপ্রথম স্থাপিত প্রার্থনাগৃহ।

ধর্ম : আরবদেশে বহু দেবতার উপাসনা বা মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল। কিন্তু সেখানে অন্যান্য ধর্মের লোকজনও বসবাস করিত। রোমানদের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া বহুসংখ্যক ইহুদী আরবদেশে আশ্রয় লইয়াছিল। উহাদের

প্রভাবেই আরবগণ এক ঈশ্বরের উপাসনা সম্পর্কে সম্যক্ ধারণা লাভ করিয়াছিল। ইহা ছাড়া সেখানে বসবাসকারী খ্রীষ্টানদের সংস্পর্শে আসিয়া আরবগণ খ্রীষ্টধর্মতত্ত্বের অনেক কিছুই জানিয়াছিল।

ইসলাম ধর্ম—হজরত মহম্মদ : আরবদেশের রাষ্ট্রনৈতিক জাগরণ এবং ইসলাম ধর্মমত একসূত্রে জড়িত। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ হজরত মহম্মদ।

৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে আরবদেশে মক্কা নগরে হজরত মহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আবদুল্লা এবং মাতা ছিলেন আমিনা বিবি। জন্মের পূর্বেই মহম্মদের পিতার মৃত্যু হয়। বাল্যকালেই তিনি মাতৃহীন হন। এই কারণে তিনি শেষ পর্যন্ত পিতৃব্য আবু তালিবের আশ্রয়ে মানুষ হন। পঁচিশ বৎসর বয়সে মহম্মদ খাদিজা নাম্নী এক বর্ষীয়সী মহিলাকে বিবাহ করেন।

দিব্যজ্ঞান অর্জন ও ধর্মপ্রচার

মহম্মদ দেখিলেন যে, তাঁহার স্বদেশবাসীর হৃদয় কুসংস্কারে পূর্ণ; তাহারা মূর্তি পূজা করে, মদ্য পান করে, বিবাদ করে ও নানাবিধ পাপাচরণ করে। কিরূপে তাহাদের উন্নতি হয় মহম্মদ তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি হীরা গিরি-গুহায় নিবিষ্ট মনে সাধনায় আত্মসমাহিত হইলেন। শেষে চল্লিশ বৎসর বয়সে হঠাৎ তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন। তিনি প্রচার করিলেন যে, আল্লাহ্ অর্থাৎ ঈশ্বর এক এবং অভিন্ন। আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য ঈশ্বর নাই। মহম্মদ আল্লাহ্ প্রেরিত পুরুষ। ইহাই হইল ইসলাম ধর্মের মূল কথা এবং মহম্মদ প্রচারিত এই ধর্মই হইল ইসলাম যাহা কোরান নামক ধর্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। কয়েকটি নির্দিষ্ট ধর্মবিশ্বাস এবং আচারের ভিত্তির উপর ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। দেবদূতের অস্তিত্ব, আত্মার অমরত্ব, মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান প্রভৃতি সাতটি ধর্মবিশ্বাস ইসলাম ধর্মে আছে। নমাজ (উপাসনা), জাকাত (দরিদ্রসেবা), রোজা (উপবাস), হজ্ (মক্কায় তীর্থযাত্রা) এবং জিহাদ (ইসলাম বিরোধীদের দমন) এই পাঁচটি ধর্মীয় আচার অবশ্য পালনীয় বলিয়া বিধান দেওয়া হইয়াছে। জুয়া খেলা ও মদ্য পান কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। স্বজাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য মহম্মদ সমবেত নমাজ, জাকাত, হজ্ প্রভৃতির বিধান দিয়াছেন।

প্রথমে তাঁহার পত্নী খাদিজা এবং কয়েকজন আত্মীয়-বন্ধু এই নূতন ধর্ম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু মক্কার লোকে এই ধর্মের এরূপ বিরোধী হইয়া উঠিল যে, ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ মক্কা ছাড়িয়া মদিনায় পলাইতে বাধ্য হইলেন। এইদিন অর্থাৎ ৬২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই হইতে মুসলমানগণ তাহাদের বর্ষ বা হিজরা গণনা করেন। এদিকে মদিনার লোকে সাগ্রহে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিল এবং মক্কাবাসীদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া এই ধর্মে দ ক্ষিত করিল। অচিরে সমস্ত আরবদেশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিল। ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ দেহত্যাগ করেন।

হিজরা গণনা

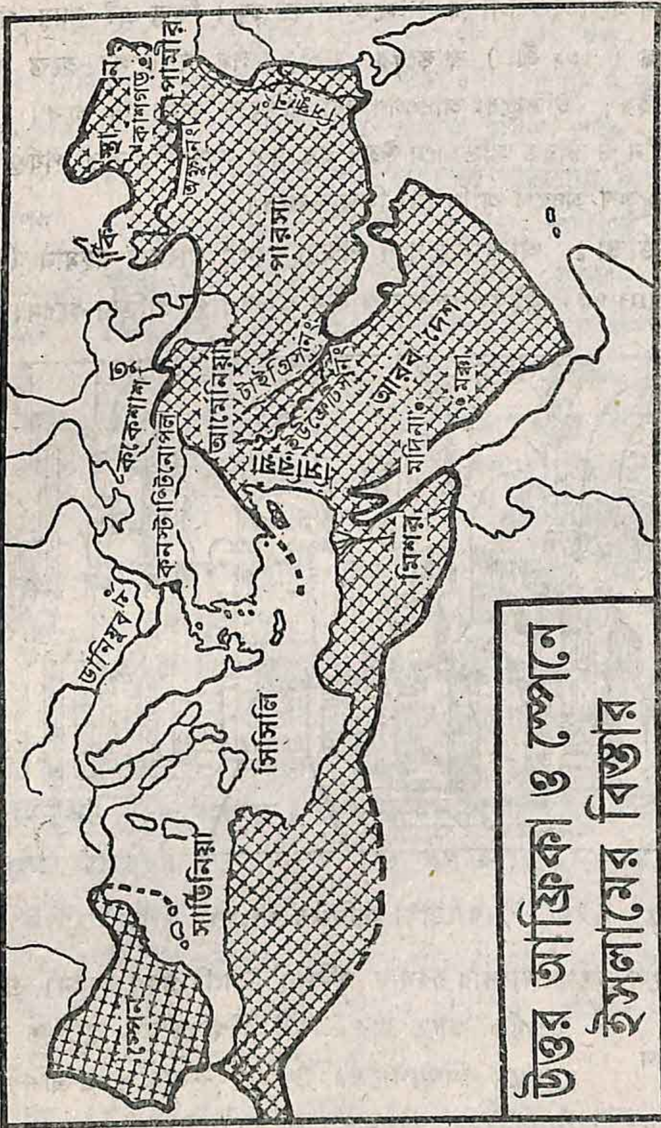
ইসলাম ধর্ম প্রসারের কারণঃ ইসলাম আরবজাতিকে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ করিয়াছিল এবং মহম্মদের বাণী পরোক্ষভাবে তাহাদের যোদ্ধৃভাব বৃদ্ধি করিয়াছিল। কিন্তু ইসলাম ধর্ম প্রসারের জন্যই এই যুদ্ধের সৃষ্টি হয় নাই, প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণেই আরবগণ রাজ্যজয়ে উৎসাহিত হইয়াছিল।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণঃ ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠার পর আরবদেশে আর্থিক দুরবস্থা চলিতেছিল এবং সেই কারণে সেখানকার লোকজন বিক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। এমতাবস্থায় সিরিয়া, পারস্য ও মিশরের প্রাচুর্য দেখিয়া তাহারা স্বভাবতই সেইসব দেশ জয় করিতে চাহিয়াছিল। ইহা ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত বেদুইন জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহ এতই বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তাহা প্রশমিত করিতে বহির্বিজয় অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল। এইসঙ্গে প্রতিবেশী রাজ্যগুলি লুণ্ঠনের অভিলাষ তাহাদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছিল।

বেদুইনদের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহ

খলিফাঃ মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী কে হইবেন তাহা লইয়া বিরোধের সূচনা হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত মহম্মদের শ্বশুর আবুবকর উত্তরাধিকারী হন। অতঃপর তিনি 'খলিফা' উপাধি লইয়াছিলেন। 'খলিফা' হইলেন মর্ত্যে মহম্মদের প্রতিনিধি এবং ইসলাম জগতের প্রধান ধর্মীয় ও রাজনৈতিক গুরু। আবুবকরের পর মহম্মদের অপর তিনজন আত্মীয়—ওমর, ওসমান ও আলী—পর পর খলিফা হইয়াছিলেন।

আরব সাম্রাজ্য ঃ মহম্মদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই আরবগণ যুদ্ধ-যাত্রায় বহির্গত হইয়া প্রথমেই বাইজানটাইন ও পারসীক সাম্রাজ্যদ্বয়কে

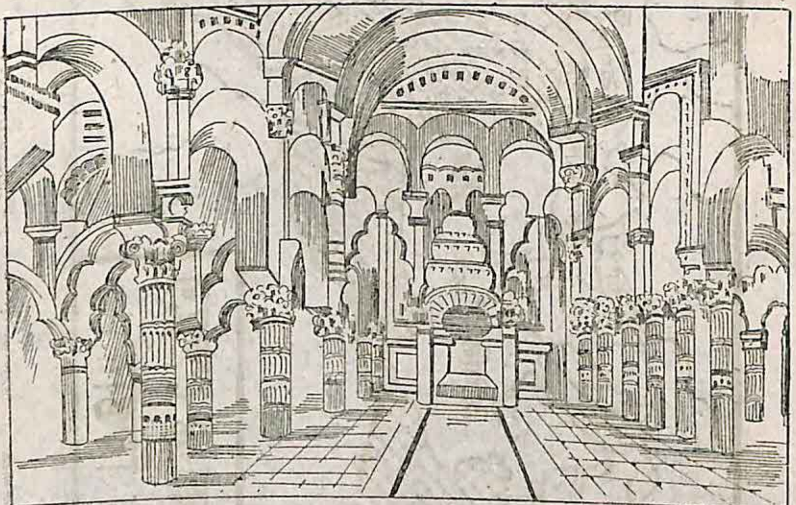


উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে ইসলামের বিস্তার

আক্রমণ করিয়া পরাজিত করে। অতঃপর সিরিয়ার বিরুদ্ধে লুণ্ঠন অভিযানের সূচনা করিয়া অচিরেই মেসোপটেমিয়া, মিশর এবং ত্রিপলি জয় করিল। ক্রমে

তাহারা উত্তর আফ্রিকায় টিউনিসিয়া, মরক্কো ও আলজিরিয়া দখল করিল। অতঃপর তাহারা ভিসিগথদের বিতাড়িত করিয়া স্পেনে আধিপত্য বিস্তার করে এবং দক্ষিণ গলের (ফরাসী দেশ) দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু এই সময় গল দেশে টুরের যুদ্ধে (৭৩২ খ্রীঃ) ফ্রাঙ্কদের নেতা চার্লস মার্টেলের হস্তে আরবগণ পরাজিত হয়। ইতিমধ্যে আরবগণ মধ্য এশিয়ায় অভিযান করে। অচিরেই তাহারা চীন ও ভারত অভিযানে উদ্যত হয় এবং অক্ষুনদীর তীর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া হিন্দুকুশ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে।

কার্ডোভা ঃ আব্বাসীয় যুগে ওম্মিয়া বংশের আবদার রহমান (Abdar Rahman) ৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনে স্বাধীন আরব রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর



কার্ডোভা মসজিদের অভ্যন্তর

৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় আবদার রহমান 'খলিফা' উপাধি গ্রহণ করেন। গ্রানাডার

স্পেনে স্বাধীন রাজ্য

অন্তর্গত কার্ডোভায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং সেখানে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে ইওরোপ ও এশিয়া হইতে শিক্ষার্থীদের সমাবেশ ঘটিত। ইহা ছাড়া কার্ডোভায় একটি বিশাল মসজিদ ছিল। সুদীর্ঘকালব্যাপী ধাপে ধাপে এই মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া এই মসজিদের নানা বর্ণশোভিত ধনুকাকৃতি ছাদ ও

গম্বুজ ছিল বাস্তবিকই এক অপূর্ব সৃষ্টি। বস্তুত ইহাতে রোমান স্থাপত্য-রীতির সহিত প্রাচ্য রীতির সমন্বয়ের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমে কার্ডোভা মুসলমান সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল।

আরব দিগ্বিজয়ে ইওরোপীয় প্রতিক্রিয়া ঃ মুসলমান সাম্রাজ্য পূর্বে কনস্টান্টিনোপল ও পশ্চিমে দক্ষিণ ফ্রান্সের সীমান্ত অঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত হয়। এই দুই সীমান্তেই তাহাদের সাফল্যের সহিত বাধা দেওয়া হইয়াছিল। উহাদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্যই সম্রাট শার্লেমান স্পেনে সৈন্য মোতায়েন করেন। কিন্তু নবম ও দশম শতাব্দীতে মুসলমানদের আক্রমণ আরও তীব্র হইল। মুসলমানগণ তখন সিসিলি, সার্ডিনিয়া ও বেলারিক দ্বীপ জয় করিয়া সমুদ্র অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। ক্রমে তাহারা দক্ষিণ ফ্রান্স ও পশ্চিম ইতালির উপকূলবর্তী অঞ্চলে লুণ্ঠন শুরু করিয়া দিয়াছিল। স্থানীয় জমিদার, বাইজানটাইন সম্রাট ও পোপের প্রচেষ্টার ফলে এই আক্রমণ সাময়িকভাবে প্রতিহত করা হয়। অচিরেই আরবরা সামুদ্রিক বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার স্থাপনে সক্ষম হয়। কিন্তু একাদশ শতকের মধ্যেই ধীরে ধীরে ইওরোপের ইসলামী ঘাঁটিগুলি পুনরায় খ্রীষ্টানদের হাতে চলিয়া আসিতে থাকে।

কনস্টান্টিনোপল ও ফ্রান্স সীমান্তে প্রতিরোধ—স্পেনে সৈন্য মোতায়েন

স্থানীয় জমিদার, সম্রাট ও পোপের প্রতিরোধ প্রচেষ্টা

আরবদের সাংস্কৃতিক অবদান ঃ আরবরা আপাতদৃষ্টিতে আদিম জাতির লোক হইলেও তাহাদের মস্তিষ্ক খুবই উর্বর ছিল এবং তাহারা পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের গ্রীক সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়াছিল। ইহা ছাড়া সুপ্রাচীন মেসোপটেমিয়া ও মিশরীয় সভ্যতার প্রভাবেও তাহারা প্রভাবিত হইয়াছিল। আরবদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও নৈপুণ্য ছাড়াও অপরাপর সভ্যতার ভালটুকু গ্রহণ করিয়া তাহা সমন্বয় সাধনের ক্ষমতা ছিল।

সাহিত্য ঃ সাহিত্যে বিশেষত গীতিকাব্যে এবং উপকথা ও গল্প লিখনে এ-যুগের মুসলমান সাহিত্যিকদের উৎকর্ষ উল্লেখ্য। সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে আরবী ভাষা ব্যবহৃত হইত। ইতিমধ্যে ঐ ভাষা অনেকখানি সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সমসাময়িক ইওরোপের অন্যান্য যে-কোন দেশের রচনা অপেক্ষা

মুসলমানদের রচনাশৈলী অনেক উন্নত ছিল। এমন কি, পাশ্চাত্য সাহিত্যের উন্নতি ও বিকাশের ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান অনস্বীকার্য।

বিজ্ঞান ঃ মুসলমানদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট কৌতূহল ছিল। তাহারা সুপ্রাচীন গ্রীসের বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছিল। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে তাহারা গ্যালেন ও হিপোক্রাট-এর গ্রীক রচনার আরবীক ভাষান্তর করে। ইহা ছাড়া তাহারা নিজস্ব পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়াও চিকিৎসা-বিদ্যার উন্নতিসাধন করে। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা অর্থাৎ রসায়ন, ভৌতবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল ও অঙ্কশাস্ত্রে মুসলমান পণ্ডিতগণ গ্রীক ঐতিহ্যের ধারক ছিলেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে তাঁহারা নিজস্ব চিন্তাধারা ও পর্যবেক্ষণসমূহ কাজে লাগাইয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমান বৈজ্ঞানিকগণ এই সময় ইতর ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করিতে এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, তখন তাঁহারা রসায়নশাস্ত্রের উন্নতির দিকে তেমন মন দেন নাই। তথাপি তাঁহারা অনেকগুলি রাসায়নিক দ্রব্যের জন্ম দিয়াছিলেন বা নামকরণ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ক্ষার (alkali), বিশুদ্ধ সুরাসার (alcohol) প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্যের নাম বিশেষত উল্লেখ্য। আরবদের মধ্যে অনেক জ্যোতির্বিদ ছিলেন। পঞ্জিকা বা বর্ষপঞ্জি আরবদেরই সৃষ্টি এবং আকাশের অনেক জ্যোতিষ্কের নামকরণের ক্ষেত্রে আরব জ্যোতির্বিদ্‌গণ অগ্রণী ভূমিকা লইয়াছিলেন।

শিক্ষাদীক্ষা ও পণ্ডিতগণ ঃ মুসলমান সমাজে জ্ঞানী-গুণীর সমাদর ছিল এবং দেশ-বিদেশের পণ্ডিতগণ বাগদাদের দরবারে সম্মানজনক আসন লাভ করিতেন। ইহা ছাড়া এই সময় স্পেন ও সিরিয়াতে শিক্ষাদীক্ষার প্রসার ঘটিয়াছিল। স্পেনের কার্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ও গৌরব ইওরোপ ও এশিয়াতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সিরিয়াতে সংস্কৃত, ল্যাটিন প্রভৃতি বিদেশী ভাষায় রচিত পুস্তকসমূহের অনুবাদের ব্যবস্থা ছিল। এমন কি, অ্যারিস্টটলের দর্শনশাস্ত্রের আরবী অনুবাদের সাহায্যে ঐ গ্রন্থ ল্যাটিনে ভাষান্তরিত হইলে পর ইওরোপের পণ্ডিতগণ সেই সম্পর্কে অবহিত হইয়াছিলেন।

মুসলমান পণ্ডিতদিগের মধ্যে দর্শনে ইবন রসিদ ও আল্‌-কিন্‌দি, ইতিহাসে আল্‌তাবারি ও ইবন খালদুন, কাব্যে ওমর, জ্যোতিষ, সঙ্গীত ও চিকিৎসাবিদ্যায় আভিসিন্না এবং সর্বশাস্ত্রজ্ঞ আলবেরুণী ও হুনাইনের নাম উল্লেখ্য।

প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক ঃ

১। ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের পূর্বে আরবদেশের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

২। হজরত মহম্মদের জীবনী ও বাণী সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখ।

৩। ইসলাম ধর্ম প্রসারের কারণ ও আরব সাম্রাজ্যের বিস্তার সম্পর্কে আলোচনা কর।

৪। আরবদের সাংস্কৃতিক অবদান সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক ঃ

(ক) আরবগণ প্রথমে কিভাবে জীবনযাপন করিত? তাহাদের প্রধান বাজার ও পীঠস্থানের নাম কি ছিল? (খ) হজরত মহম্মদ কোন্ গিরিগুহায় সাধনা করিতেন এবং কোন্ ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন? (গ) কোন্ সময় মহম্মদ মক্কা ছাড়িয়া মদিনায় পলায়ন করেন? ঐ দিনটি কি জন্য বিখ্যাত? (ঘ) কি কারণে ইসলাম ধর্ম প্রসারিত হইয়াছিল? (ঙ) খলিফা বলিতে কি বুঝ? (চ) কার্ডোভা কিজন্য বিখ্যাত? (ছ) আরব দিগ্বিজয়ের ইওরোপীয় প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইয়াছিল? (জ) মধ্যযুগে আরবদের সাহিত্য কিরূপ উন্নত ছিল? (ঝ) আরবদেশের শিক্ষাদীক্ষার উন্নতি সম্পর্কে কি জান? আরব পণ্ডিতগণের মধ্যে কয়েকজনের পরিচয় দাও।

এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(১) আরবদেশ কোথায় অবস্থিত? (২) আরবদের প্রধান বাজারের নাম কি? (৩) কাবা কি এবং কোন্ শহরে অবস্থিত? (৪) ইসলাম ধর্মের প্রবর্তকের নাম কি? (৫) হিজরা বলিতে কি বুঝ? (৬) মহম্মদের মৃত্যুর পর কে খলিফা হইয়াছিলেন? (৭) মহম্মদের আত্মীয়দের মধ্যে কে কে খলিফা হইয়াছিলেন? (৮) কোন্ যুদ্ধে মুসলমানগণ চার্লস মার্টেলের হস্তে পরাজিত হইয়াছিল? (৯) কার্ডোভা কোথায় অবস্থিত? (১০) আরবগণ কি কি রাসায়নিক দ্রব্যের নামকরণ করিয়াছিলেন?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১। মক্কায় ছিল আরবদের পবিত্র — মসজিদ; ২। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন —; ৩। — খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ মক্কা ছাড়িয়া — পলাইতে বাধ্য হন; ৪। ৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে — যুদ্ধে — হস্তে আরবগণ পরাজিত হয়; ৫। পঞ্জিকা বা বর্ষপঞ্জি — সৃষ্টি এবং আকাশের অনেক — নামকরণের ক্ষেত্রে — অবদান অনস্বীকার্য।

———

ষষ্ঠ অধ্যায়

মধ্যযুগে পশ্চিম ইওরোপ

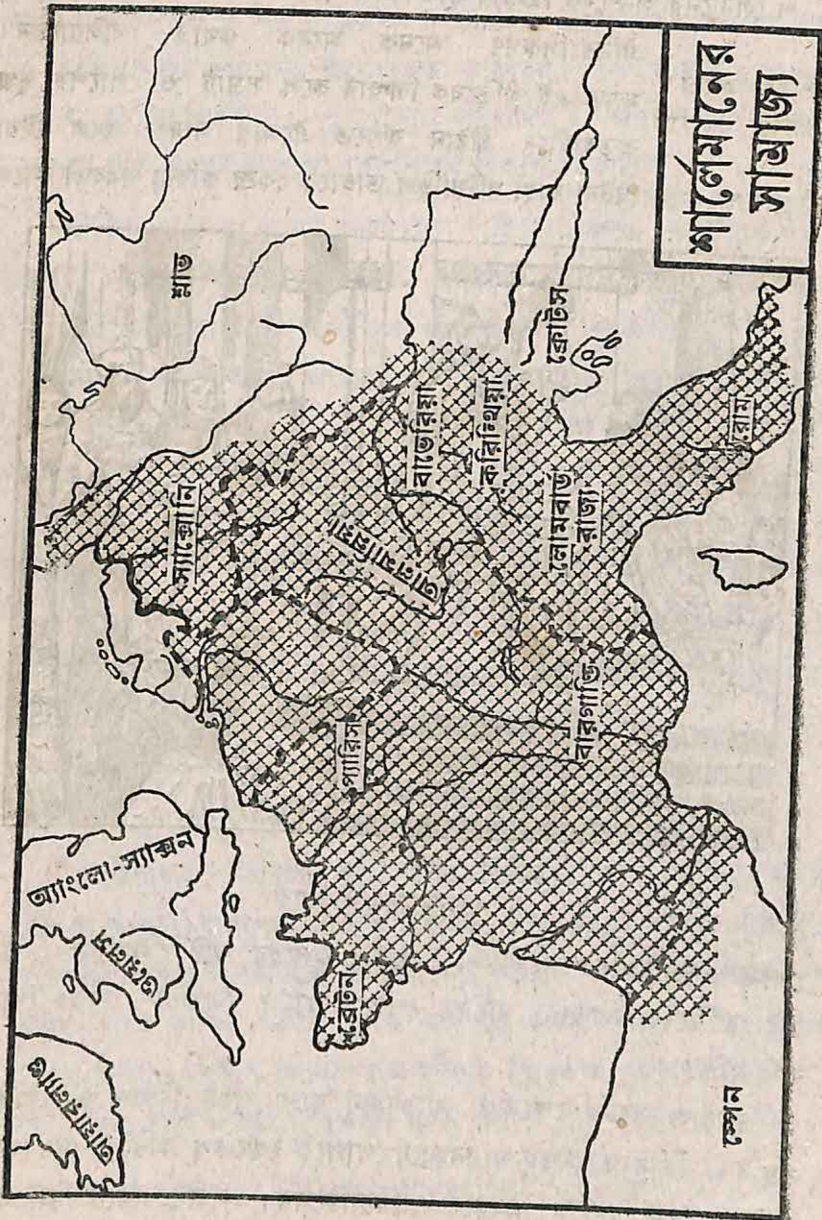
(ক)

শার্লেমান ঃ ৭৭১ হইতে ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শার্লেমান জার্মান জাতির অন্যতম শাখা ফ্রাঙ্কদের রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন দিগ্বিজয়ী বীর যোদ্ধা। তেতাল্লিশ বৎসরব্যাপী রাজত্বের মধ্যে তিনি অন্তত তিপান্নবার রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বহু রাজ্য জয় করিয়া তিনি বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারী হন। ফ্রান্স, ইতালির লম্বার্ডি, জার্মানির অন্তর্গত স্যাক্সনি, ব্যাভেরিয়া ও স্পেন প্রভৃতি রাজ্য তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে শার্লেমান "পবিত্র রোমান" সম্রাটের পদে অধিষ্ঠিত হন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি ঐ পদে বৃত ছিলেন। ৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রোমান সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় ঃ শার্লেমানের আমলের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হইল রোমান সাম্রাজ্যের পুনরভ্যুদয়। এই সময় রোমের পোপ লিও'র সহিত স্থানীয় অ-খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের লোকজনের মধ্যে বিরোধ বাধিয়াছিল। ক্রমে ঘটনা এমন হইল যাহাতে পোপ রোম হইতে বিতাড়িত হইলেন। পোপ তখন শার্লেমানের কাছে প্রতিকার দাবি করিলেন। ফলে ৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শার্লেমান রোমে আসিয়া পোপকে রোমের গীর্জায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন।

অভিষেক ক্রিয়া

এই ঘটনার পর শার্লেমান ঐ বৎসর খ্রীষ্টের জন্মদিবসে রোমের সেণ্ট পিটার্স গীর্জায় উপস্থিত হন। সেখানে তখন মহাসমারোহে বড়দিনের উৎসব চলিতেছিল। শার্লেমান স্বভাবতই প্রার্থনার জন্য নতজানু হইলে অকস্মাৎ পোপ লিও শার্লেমানের মাথায় একটি মুকুট স্থাপন করেন এবং উপস্থিত জনতার জয়ধ্বনির মধ্যে তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সমবেত জনগণ তখনই শার্লেমানকে পোপের অভিষিক্ত সম্রাট বলিয়া অভিনন্দন জানাইল। এইভাবে সুপ্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের পুনরভ্যুদয় ঘটিল। শার্লেমানের নূতন উপাধি হইল "পবিত্র রোমান সম্রাট"।


শার্লেমানের সাম্রাজ্য
স্লাভ
ক্রোটস
বাভেরিয়া
ক্যারিন্থিয়া
লোমবার্ড রাজ্য
রোম
স্যাক্সোনি
প্যারিস
বারগাণ্ডি
ব্রেটন
অ্যাংলো-স্যাক্সন
স্পেন

শার্লেমানের অভিষেক ক্রিয়ার তাৎপর্য সম্পর্কে সমসাময়িক ও আধুনিক ঐতিহাসিকগণ অনেক অনেক কথাই বলিয়াছেন।

অভিষেক-ক্রিয়ার তাৎপর্য

মূলত এই অভিষেক ক্রিয়ার ফলে সম্রাট ও পোপের যুগ্ম কর্তৃত্বাধীনে খ্রীষ্টান জগতে ঐক্যের আদর্শ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তবে ঘটনা যাহা ঘটিয়াছিল তাহাকে কেন্দ্র করিয়া পরবর্তী কালে



শার্লেমানের অভিষেক

পোপ ও সম্রাটগণের মধ্যে নানা বিতর্ক ও কলহের সৃষ্টি হইয়াছিল। কারণ এই অভিষেক ক্রিয়ার মাধ্যমে পোপ কার্যত নিজেরই শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়াছিলেন।

রাষ্ট্র ও চার্চের সম্পর্ক ঃ শার্লেমান ছিলেন খুবই বিচক্ষণ ও শক্তিশালী সম্রাট। তিনি স্বভাবতই শাসনকার্যে পোপকে হস্তক্ষেপ করিতে দেন নাই। অধিকন্তু তিনি চার্চকে নিয়ন্ত্রণে রাখিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে তিনি ধর্মীয় সভা আহ্বান করিতেন এবং এই সকল সভার অধিবেশনে তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিতেন।

শিল্পকলা ও সাহিত্যের বিকাশঃ শার্লেমানের রাজসভায় দেশের অনেক জ্ঞানী-গুণী ও শিল্পীর সমাবেশ হইয়াছিল। শার্লেমান চারুকলার উন্নতি ও বিকাশের জন্য শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। ফলে তাঁহার রাজত্বকালে রোমের প্রাচীন শিল্পরীতির পুনঃপ্রকাশ ঘটিয়াছিল। অনুরূপভাবে সরকারী অনুদান ও উদ্যোগের ফলে স্থাপত্য-শিল্পের বিকাশ হইয়াছিল।

সাহিত্যঃ শার্লেমানের রাজত্বকালে সাহিত্যের ক্ষেত্রে চরম উন্নতি ঘটিয়াছিল। শার্লেমানের বন্ধু ও কর্মসচিব এইনহার্ড সম্রাটের যে জীবনীগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহার সাহিত্যিক মূল্য সম্পর্কে কোন দ্বিমত নাই। ইহা ছাড়া ঐ সময় পল নামক লম্বার্ড অঞ্চলের জনৈক ঐতিহাসিক 'লম্বার্ডদের ইতিহাস' রচনা করেন। এই সকল গ্রন্থ গদ্যে রচিত। গদ্য অপেক্ষা শার্লেমানের আমল কাব্য-সাহিত্যের উৎকর্ষ ও বিকাশের জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। এ-যুগের অনেক কবির রচনায় অবশ্য নূতন কিছু ছিল না, কারণ সুপ্রাচীন যুগের শ্রেষ্ঠ কাব্যসমূহের অনুকরণই ছিল এই সকল কবির প্রধান কাজ। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আলকুইন, থিয়োডল্‌ফ্‌, স্ট্রাবো প্রমুখ সুধীজন কাব্যের ক্ষেত্রে সজীবতা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন। সেই কারণে ইহা সততই বলা হইয়া থাকে যে, শার্লেমানের সময়ে সাহিত্যে নব-যুগ বা রেনেসাঁসের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল।

(খ)

মঠ-জীবনঃ মধ্যযুগে ইওরোপের বিভিন্ন প্রান্তে ধর্মীয় মঠের অবস্থান দেখিতে পাওয়া যাইত। সেগুলি প্রধানত শহর হইতে অনেক দূরে কোন পাহাড়ের কোলে বা বনাঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করা হইত। স্বভাবতই যাহারা সংসার জীবন ত্যাগ করিয়া নির্জন স্থানে শান্তিতে জীবন যাপন করিতে চাহিত তাহাদের পক্ষে মঠগুলি আদর্শ স্থান বলিয়া বিবেচিত হইত। ফলে ধর্মের জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া অনেক স্ত্রী-পুরুষ ঐসকল মঠে আশ্রয় লইয়াছিল।

মঠবাসী পুরুষদের 'মঙ্ক' ও মঠের অধ্যক্ষকে 'এবট' নামে অভিহিত করা হইত এবং তাহাদের মঠকে বলা হইত 'এবি'। সেইরূপ স্ত্রী-যাজকদের নাম ছিল 'নান' এবং স্ত্রীলোক-অধ্যুষিত মঠকে 'নানারি' বলা হইত।

মঠবাসীদের কঠোর আত্মসংযমী হইতে হইত। তাহারা কতকগুলি নির্দিষ্ট আচরণবিধি মানিয়া চলিত। এই সকল আচরণবিধির মধ্যে সংযম, কৃচ্ছ্রসাধন ও কর্তব্য পালন প্রভৃতি উল্লেখ্য। বস্তুত মঠ-জীবনে এই সকল আদর্শ প্রবর্তন করিয়া সে-যুগে সন্ত বেনেডিক্ট অশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

সুপ্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণে এবং ইওরোপীয় শিক্ষাদীক্ষার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বেনেডিক্টের বিশেষ আগ্রহ ছিল না। তাই



মধ্যযুগের ইওরোপীয় মঠ



মঠবাসী সন্ন্যাসী

এক্ষেত্রে সে-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ক্যাসিডোরাসের ভূমিকা স্মরণীয়। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মঠে পুস্তক সংরক্ষণের জন্য গ্রন্থাগার ছিল। বহু মূল্যবান প্রাচীন পুঁথি সংকলন করিয়া এবং অনেক পুঁথির নকল করিয়া তিনি সেগুলি তাঁহার গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ক্রমে অন্যান্য মঠও ক্যাসিডোরাসের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া পুঁথিপত্র সংরক্ষণ করিতে ও শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হইয়াছিল।

ক্লুণির মঠ ঃ প্রথম দিকে মঠ-জীবন অত্যন্ত কঠোর ছিল। কিন্তু কালক্রমে মঠের জীবনধারা ক্রমশ শিথিল হইয়া পড়িতেছিল। ফলে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে মঠ-জীবনে সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। এমতাবস্থায় ৯১০ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাকুইটাইনের ডিউক উইলিয়ম ক্লুণির মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার প্রথম অ্যাবট ছিলেন বারনো নামে জনৈক নিষ্ঠাবান সন্ন্যাসী। ফলে

অচিরেই দেশের সর্বত্র এই মঠের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইওরোপের নানাস্থানে ইহার কতকগুলি শাখাও খোলা হইয়াছিল।

ক্লুণি প্রবর্তিত সংস্কার-আন্দোলনের মূল লক্ষ্যই ছিল চার্চ-ব্যবস্থাকে রাজা ও সামন্তদের নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত করা এবং পুরোহিত বা যাজকদের উপর পোপের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা। কারণ ইতিমধ্যে সামন্ত প্রভুগণ তাঁহাদের এক্তিয়ারভুক্ত গীর্জা ও মঠের বিশপ ও এ্যাবটদের অভিষেকক্রিয়ার দ্বারা নিয়োগ করিতেন। রীতি অনুযায়ী সামন্ত প্রভুগণ ধর্মীয় অঙ্গুরী ও ছড়ি প্রদান করিয়া বিশপ ও এ্যাবটদের অভিষিক্ত করিতেন। ক্লুণির সংস্কারকগণ এই রীতি বন্ধ করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

(গ)

অভিষেক ক্রিয়া-সংক্রান্ত বিরোধ: একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্লুণির সংস্কারকগণ তাঁহাদের লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু ক্লুণির সংস্কার আন্দোলনের সাফল্যের অর্থই ছিল ধর্মীয় তথা চার্চ-সংক্রান্ত সবকিছু হইতে বৈষয়িক লোকদের বহিষ্কার। ফলে ইহা শেষ পর্যন্ত রাজশক্তিকে আঘাত হানিয়াছিল। এদিকে এই সময় হিল্‌ডেব্রাণ্ড নামে এক মঠচারী সন্ন্যাসী সপ্তম গ্রেগরী নাম লইয়া পোপ পদে অধিষ্ঠিত হন। ১০৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এক ধর্মীয় সভায় তিনি রাজা বা সামন্তগণ অর্থাৎ বৈষয়িক ব্যক্তিবর্গের, বিশপ বা এ্যাবটদের অভিষেক ক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। কিন্তু তদানীন্তন জার্মান সম্রাট চতুর্থ হেনরী ইহার বিরোধিতা করিলে অভিষেক ক্রিয়াকে কেন্দ্র করিয়া সম্রাট ও পোপের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই চরমে উঠিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত 'ক্যানোসা' (Canossa)-র ঘটনা বিশেষত উল্লেখযোগ্য। ধর্মীয় ব্যাপারে পোপের শ্রেষ্ঠত্ব ও নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতা করিবার ফলে পোপ সপ্তম গ্রেগরী তখন এতই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার 'ক্ষমতাবলে' জার্মান সম্রাট চতুর্থ হেনরীকে সিংহাসনচ্যুত ও খ্রীষ্টীয় সমাজ হইতে 'বহিষ্কৃত' বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহাতে জার্মান অভিজাতবর্গের সমর্থন থাকায় সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশে ব্যাপক সম্রাট-বিরোধী বিদ্রোহ দেখা দিল। স্বভাবতই বিপাকে পড়িয়া হতাশাগ্রস্ত সম্রাট তখন রাজকীয় বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া নগ্নপদে শীতকালীন তুষারাবৃত আল্‌পস পর্বত অতিক্রম

করিয়া পোপের সন্ধানে ক্যানোসা নামক দুর্গে হাজির হন (১০৭৭ খ্রীঃ)। সেখানে তিনদিন অপেক্ষা করিবার পর পোপ সম্রাটের প্রতি সদয় হন এবং ক্ষমা করেন। তবে এই ঘটনার পরও সম্রাট ও পোপের মধ্যে বিরোধের অবসান হয় নাই, ফলে ইহা চলিতেই থাকে। অবশেষে ১১২২ খ্রীষ্টাব্দে 'ওরমস্' (Concordat of Worms)-এর চুক্তির ফলে এই বিরোধের অনেকাংশে নিষ্পত্তি হইয়াছিল।

(ঘ)

বিশ্ববিদ্যালয়

উৎপত্তির কারণঃ মধ্যযুগের প্রথম পর্বে ইওরোপের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত মঠগুলিতে শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে নূতন নূতন ব্যবসায়-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করিয়া শহর-জীবনের সূচনা হইলে ইওরোপের শহরাঞ্চলের লোকজন শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি চাহিয়াছিল। ইতিমধ্যে ইওরোপের বড় বড় গীর্জার অধীন কতিপয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু শহরের অধিবাসিগণ তাহাতে সন্তুষ্ট ছিল না। তাহারা শিক্ষার আরও ব্যাপক উন্নতিতে আগ্রহী ছিল। এদিকে পশ্চিম এশিয়া, মিশর এবং স্পেনে মুসলমান সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল। শিক্ষার উন্নতির জন্য মুসলমানগণ কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া তুলিয়াছিল। ক্রমে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ইওরোপের বড় বড় শহরে বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিতে থাকে। এগুলির মধ্যে প্যারিস, বোলোগ্না ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষত উল্লেখযোগ্য।

শহর-জীবনের সূচনা



বিশ্ববিদ্যালয়

মুসলমান সভ্যতার প্রভাব

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সাধারণত ছাত্র ও শিক্ষকের নিজ নিজ প্রয়োজনের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। শিক্ষার্থীরা আসিয়া শিক্ষকগণের সহিত মিলিত হইত। ফলে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ে মিলিত হইয়া একই স্বার্থে কতকগুলি সংঘ স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিল। পরবর্তী কালে এই সংঘগুলিই 'বিশ্ববিদ্যালয়'-এর রূপ লইয়াছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কতিপয় রাজা ও পোপ এগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উন্নতি ও ক্রমবিকাশ ঘটিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতগণ : প্রথম হইতেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সে-যুগের উচ্চ-শিক্ষার ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার অর্জনে সমর্থ হইয়াছিল। স্বভাবতই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বহু পণ্ডিত ও মনীষীর সমাবেশ ঘটিয়াছিল। এই সকল পণ্ডিতদিগের ভিতর এবেলার্ড, টমাস একুইয়ানাস এবং রজার বেকনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এবেলার্ড ছিলেন ফরাসী এবং অসাধারণ পণ্ডিত। অনেকের মতে সক্রেটিসের পর এতবড় পণ্ডিত আর জন্মে নাই। একুইয়ানাস (১২২৪-১২৭৪ খ্রীঃ) রোম, প্যারিস, পিসা প্রভৃতি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করেন। ইহা ছাড়া তিনি অনেকগুলি মূল্যবান পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। সে-যুগে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পথ-প্রদর্শক হিসাবে রজার বেকনের নাম অবিস্মরণীয়। তিনি ছিলেন ইংরাজ।

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক : বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণের ভিতর মধুর সম্পর্ক ছিল। শিক্ষকগণের জন্য নির্দিষ্ট কোন আলোচনা-গৃহ বা বক্তৃতা-কক্ষ থাকিত না। ছাত্ররা সাধারণত মেঝেতে বসিয়া বক্তৃতা শুনিত। ইহা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে কতকগুলি ছিল ছাত্র-নিয়ন্ত্রিত বিশ্ববিদ্যালয়, যথা—বোলোগ্না। তবে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণভার ছিল শিক্ষকগণের উপর যথা—প্যারিস, অক্সফোর্ড ইত্যাদি।

পঠন-পাঠন-সংক্রান্ত বিষয়ে খ্যাতির প্রসার : মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে বিভিন্ন শাস্ত্রচর্চার ব্যবস্থা ছিল। প্রথমত, আইন-সংক্রান্ত বিষয়ে বোলোগ্না বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান উল্লেখ্য। সেখানে ইরনেরিয়াম নামক জনৈক অধ্যাপক সুবিখ্যাত 'জাস্টিনিয়ানের' আইন চর্চা করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি কতিপয় গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আইন-সংক্রান্ত বিষয়ে বক্তৃতা শুনিয়া ছাত্ররা মুগ্ধ

আইনচর্চা

হইত। এমন কি, তাঁহার গুণমুগ্ধ ছাত্রগণের প্রচেষ্টার ফলে রোমান আইনের খ্যাতি অন্যত্র ছড়াইয়া পড়ে। ফলে মণ্টপেলিয়া, অর্লিয়েন্স, প্যারিস প্রভৃতি ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও রোমান আইনের চর্চা বৃদ্ধি পাইতেছিল। যাহা হউক, সেই সময় অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়েই গ্রেসিয়ামের আইন (Decretum) ও জাস্‌টিনিয়ানের আইন পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দ্বিতীয়ত, ইতালির সলেরনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভেষজবিদ্যার চর্চা ও অনুশীলনের ব্যবস্থা ছিল।

ভেষজশাস্ত্র ও ঈশ্বরতত্ত্ব

প্রধানত, হিপ্পোক্রেটস্ ও গ্যালনের ভেষজশাস্ত্র-সংক্রান্ত আলোচনাসমূহ এবং আভিস্কেনার ভেষজবিধি (Conon of Medicine) পড়ান হইত। তৃতীয়ত, ঈশ্বরতত্ত্ব সম্পর্কে সে-যুগে বহু গ্রন্থাদি রচিত হইয়াছিল। তবে এই সম্পর্কে টমাস একুইয়ানাসের "ঈশ্বরতত্ত্বের সংক্ষিপ্তসার"ই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইত। চতুর্থত, যুক্তিবিদ্যা বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য সেই সময় বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক

যুক্তিবিদ্যার প্রাধান্য

অ্যারিস্টটলের সমুদয় গ্রন্থই আলোচিত হইত। ইহা ছাড়া প্লেটোর রচনাদিও পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এমন কি, কলাবিভাগে স্নাতক উপাধি অর্জনের জন্য সেই সময় শুধুমাত্র অ্যারিস্টটলের রচনাদিতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করিতে পারিলেই চলিত। ইতিপূর্বে মঠ ও চার্চের অধীন বিদ্যালয়ে মনের ঔদার্যবর্ধক বিদ্যাসমূহের (liberal arts) চর্চা হইত। ইহা ছাড়া প্রাচীন শ্রেষ্ঠ ল্যাটিন সাহিত্য-বিষয়ক গ্রন্থাদির পঠন-পাঠন ইওরোপীয় শিক্ষাধারার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনের প্রাধান্যহেতু সাহিত্য-সংক্রান্ত বিষয়ে পঠন-পাঠন কমিয়া গিয়াছিল।

প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক ঃ

১। সম্রাট শার্লেমানের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

২। কিভাবে শার্লেমান পবিত্র রোমান সম্রাট হন? তাঁহার অভিষেক ক্রিয়ার তাৎপর্য নিরূপণ কর।

৩। শার্লেমানের রাজত্বকালে সম্রাটের সহিত চার্চের সম্পর্ক ও সাহিত্যের বিকাশ সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৪। ইওরোপের মঠ-জীবন-ধারা সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৫। ইওরোপে বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তি ও উন্নতি সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখ।

৬। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কোন্ কোন্ বিষয়ে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা ছিল ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক ঃ

(ক) শার্লেমান কতবার যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন এবং কোন্ কোন্ রাজ্য সাম্রাজ্য-ভুক্ত করেন ? (খ) শার্লেমানের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি কি ছিল ? (গ) শার্লেমানের অভিষেক ক্রিয়ার তাৎপর্য কি ছিল ? (ঘ) শার্লেমানের রাজত্বকালে সাহিত্যের কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল ? (ঙ) কিরূপ স্থানে এবং কি উদ্দেশ্যে মঠগুলি স্থাপিত হইয়াছিল ? (চ) মঠবাসী পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের কি নামে অভিহিত করা হইত ? (ছ) কে ক্লুণির মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং ঐ মঠ কি কারণে বিখ্যাত হইয়াছিল ? (জ) কি কারণে সম্রাটের সহিত পোপের অভিষেক ক্রিয়া-সংক্রান্ত বিরোধের স্থচনা হইয়াছিল ? (ঝ) বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্থানের কারণ কি ছিল ? (ঞ) একুইয়ানাস কে ছিলেন ? (ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকের পরস্পর সম্পর্ক কিরূপ ছিল ? (ঠ) 'ক্যানোসা'র ঘটনা বলিতে কি বুঝ ?

এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(১) শার্লেমান কে ছিলেন ? (২) কোন্ বৎসর শার্লেমানের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল ? (৩) সাহিত্যের উন্নতির জন্য শার্লেমানের যুগকে কি নামে অভিহিত করা হয় ? (৪) পুরুষদের ও স্ত্রীলোকদের মঠগুলি কি নামে অভিহিত করা হইত ? (৫) বারনো কে ছিলেন ? (৬) সন্ত বেনেডিক্ট কি জন্য বিখ্যাত ? (৭) অভিষেক ক্রিয়া-সংক্রান্ত বিবাদে লিপ্ত সম্রাট ও পোপের নাম কি ছিল ? (৮) এবেলার্ড কে ছিলেন ? (৯) কোন্ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রগণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইত ?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১। — খ্রীষ্টাব্দে শার্লেমান — সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত হন ; ২। শার্লেমান প্রার্থনার জন্য নতজানু হইলে — অকস্মাৎ তাঁহার মস্তকে মুকুট স্থাপন করেন ; ৩। — নামক জনৈক ঐতিহাসিক 'লম্বার্ডদের' ইতিহাস রচনা করেন ; ৪। মঠগুলি শহর হইতে অনেক দূরে — বা বনাঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করা হইত ; ৫। পুরুষদের মঠকে বলা হইত — এবং স্ত্রীলোক-অধ্যুষিত মঠকে — বলা হইত ; ৬। ৯১০ খ্রীষ্টাব্দে — ক্লুণির মঠ প্রতিষ্ঠা করেন ; ৭। মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে প্যারিস, — ও — বিশেষত উল্লেখযোগ্য।

সপ্তম অধ্যায়

মধ্যযুগের ইওরোপে সামন্ততন্ত্র

সূচনা ঃ মধ্যযুগে কৃষিকর্মই ছিল অন্যতম প্রধান উপজীবিকা। কৃষিকর্মে ভূ-সম্পদে গুরুত্ব সর্বাগ্রহণ্য। রাজা দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তির ভিতর ভূমি বণ্টন করিয়া দিতেন এবং তাঁহারা সামন্ত নামে পরিচিত হইতেন। যুদ্ধের সময় রাজাকে অর্থ ও জনবল যোগাইবার শর্তে সামন্তগণ ভূ-সম্পত্তির অধিকার

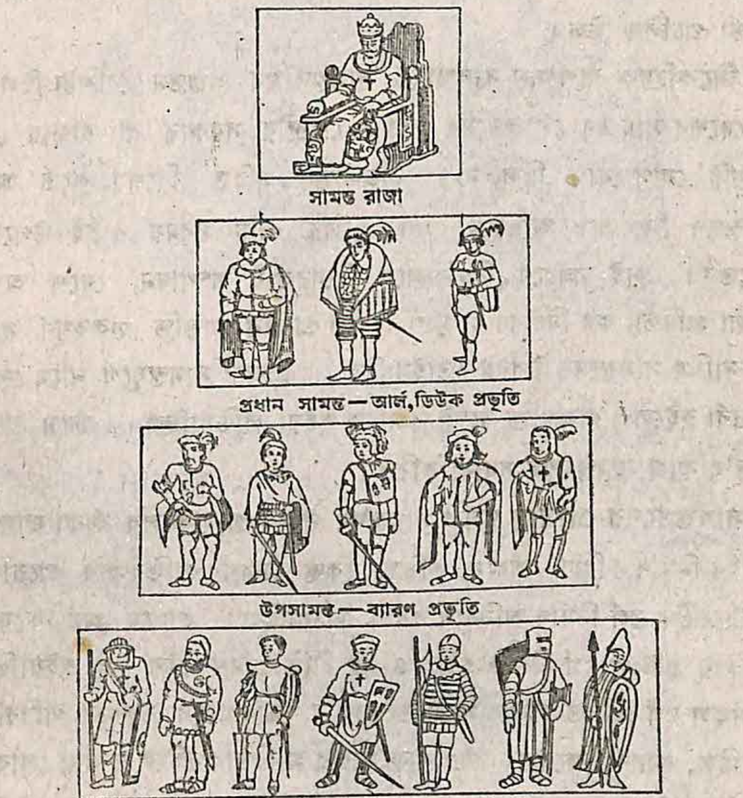


সামন্তগণের শপথ অনুষ্ঠান

পাইতেন। সামন্তগণ আবার রাজার মত নিজ নিজ এক্তিয়ারভুক্ত জমিজমা খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রজাদের ভিতর বণ্টন করিয়া দিতেন। প্রজারা তাহাদের নিজ নিজ সামন্তপ্রভুর প্রয়োজনমত অর্থ ও শ্রমদানে স্বীকৃত হইত। এইভাবে জমিকে

কেন্দ্র করিয়া ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির বাধ্যতামূলক আনুগত্যের বন্ধন গড়িয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে এই বন্ধন সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে সামন্তগণের মধ্যে শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠান প্রবর্তিত হয়। মোটামুটিভাবে এই ব্যবস্থাই ফিউডালিজম বা সামন্ততন্ত্র নামে পরিচিত।

ভূমিবণ্টন-সংক্রান্ত চুক্তি



ক্রমোচ্চতার ভিত্তিতে স্তরভেদ

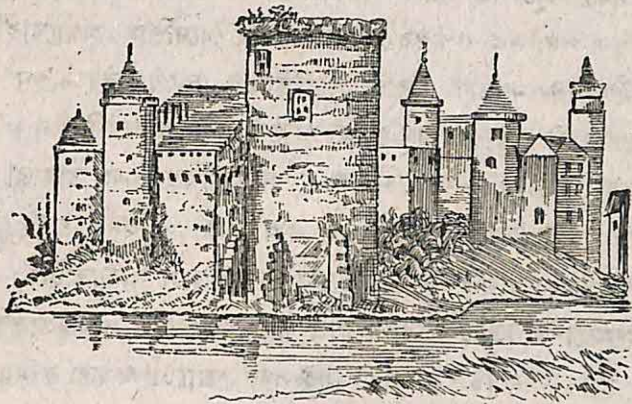
কিন্তু এই ব্যবস্থায় জমির মালিকানা বা ব্যবহারের অধিকার কোন একটি স্তরে

পুরাপুরি বর্তায় নাই। জমিতে দেশের রাজা হইতে শুরু করিয়া ধাপে ধাপে বিভিন্ন স্তরের সামন্তবর্গ এবং সর্বনিম্নে কৃষকগণের বহুতর স্বত্বের সমাবেশ ঘটিত। ছোট জমিদারের উপর বড় জমিদার, তাহার উপর আরও বড় জমিদার বা সামন্ত এবং সবার উপর রাজা—এইরূপ ক্রমোচ্চ স্তরভেদ-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

বিকেন্দ্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা ঃ সামন্ততন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, দেশের সাধারণ লোকজনের সহিত কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজার কোন সরাসরি যোগাযোগ ছিল না। রাজশক্তির সহিত বিশেষ শর্তে আবদ্ধ সামন্তগণ নিজেদের অধিকৃত অঞ্চলগুলির প্রায় সর্বময় কর্তৃত্ব উপভোগ করিতেন। সেই কারণে বিচারালয়ে বিচারকার্য সম্পাদন, দেশে আইন-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা, কর নির্ধারণ বা মুদ্রা ব্যবস্থা প্রবর্তন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় দায়-দায়িত্ব সামন্তদের উপরই বর্তাইয়াছিল। সুতরাং সামন্তযুগে নামে দেশের সর্বেসর্বা হইলেও রাজশক্তি যথেষ্ট সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। ক্রমে রাষ্ট্রের যাবতীয় কাজ সামন্তগণই সমাধা করিত।

সামন্তগণের প্রাসাদ দুর্গ ঃ সামন্তগণ প্রথমে গ্রামাঞ্চলের ফাঁকা জায়গায় ঘরবাড়ি নির্মাণ করিয়া বসবাস করিত, কিন্তু ক্রমশ প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে প্রাচীরবেষ্টিত দুর্গ নির্মাণ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথমে অল্প কয়েকটি এলাকায় এইরূপ দুর্গ নির্মিত হইলেও এই রীতি ক্রমশ সর্বত্র চালু হইয়াছিল। এই সকল দুর্গ নির্মিত হইবার ফলে তৎকালীন যুদ্ধবিগ্রহের প্রকৃতিও পরিবর্তিত হইয়াছিল, কারণ এক্ষণে কোথাও শত্রুসৈন্যের আবির্ভাব ঘটিলে স্থানীয় লোকজন সহজেই দুর্গের ভিতর আশ্রয় পাইত। ফলে শত্রুসৈন্য আর অকস্মাৎ আসিয়া পূর্বের ন্যায় অরক্ষিত এলাকায় সহজে লুটপাট করিবার সুযোগ পাইত না। শত্রুসৈন্যের পক্ষেও দীর্ঘকাল ধরিয়া দুর্গ অবরোধ করা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। এমতাবস্থায় দুর্গস্থ লোকজন তখনই আত্মসমর্পণ করিত যখন দীর্ঘকাল অবরোধের ফলে দুর্গে খাদ্যাভাব দেখা দিত। কিন্তু এইজন্য অনেক ক্ষেত্রে শত্রুসৈন্যকে তিন মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইত, যাহা তৎকালীন বৈদেশিক আক্রমণ-কারীদের মধ্যে কেহই পছন্দ করিত না। কারণ ইহার ফলে তাহাদের লুণ্ঠনদ্রব্যের পরিমাণ কম হইত। ইহা ছাড়া কোন একটি এলাকায় দীর্ঘ সময়

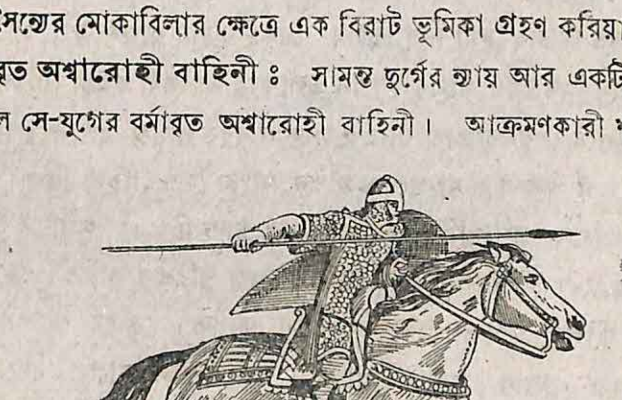
ধরিয়া দুর্গ অবরোধ হইলে সমগ্র দেশ সজাগ হইয়া উঠিত। ফলে শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশের সামরিক শক্তি সংঘবদ্ধভাবে আক্রমণ চালাইত। এই সকল



সামন্তগণের প্রাসাদ দুর্গ

কারণে একথা সহজেই অনুমিত হয় যে, সামন্ত প্রভুগণের নির্মিত এই সকল প্রাসাদ দুর্গ শত্রুসৈন্যের মোকাবিলার ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল।

বর্মাবৃত অশ্বারোহী বাহিনী ঃ সামন্ত দুর্গের ন্যায় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল সে-যুগের বর্মাবৃত অশ্বারোহী বাহিনী। আক্রমণকারী শত্রুসৈন্যের



বর্মাবৃত নাইট

মোকাবিলা করিতে ও যুগোপযোগী সামরিক দক্ষতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই

অশ্বারোহী বাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব সুবিদিত। কারণ আক্রমণকারী সৈন্যদল তড়িৎ-গতিতে সর্বত্র লুটপাট শুরু করিয়া দিত। এদিকে সমসাময়িক ইওরোপের সৈন্যদল ছিল পদাতিক ও মন্থরগতিসম্পন্ন এবং বৈদেশিক অশ্বারোহী বাহিনীর সম্মুখে নিতান্তই নগণ্য। তাই পরিস্থিতির চাপে তদানীন্তন সামন্তগণ একদল সুসংগঠিত বর্মাবৃত অশ্বারোহী বাহিনী গঠন করিয়াছিলেন। এই সৈন্য-দলের মধ্যে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা বিরাজ করিত এবং তাহারা যুদ্ধের জন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ক্রমে এই অশ্বারোহী বাহিনী এতই দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল যে, বৈদেশিক লুণ্ঠন-অভিযান ক্রমেই হ্রাস পাইতেছিল।

সামন্ততন্ত্র-আশ্রিত জীবনধারা : নবম শতাব্দীতে সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাব অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল। কারণ সেই সময় সম্রাটের ক্ষমতা কমিয়া গিয়াছিল এবং পশ্চিম ইওরোপ কতকগুলি খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজগণ নিজ নিজ রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। ফলে বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করিবার মত যোগ্যতারও অভাব দেখা দিয়াছিল। এমতাবস্থায় রাজশক্তির সহিত বিশেষ শর্তে আবদ্ধ সামন্তগণ আপন আপন এলাকায় সর্বেসর্বা হইয়া উঠিল। এইভাবে পশ্চিম ইওরোপের প্রত্যেক রাজ্যই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সামন্ত এলাকায় বিভক্ত হইয়া পড়িল। ঐ সকল সামন্তগণের আপন আপন সৈন্যবাহিনী ছিল। তাহাদের আপন আপন প্রশাসনিক ব্যবস্থাও বেশ সুদৃঢ় ছিল। অগণিত টুকরা টুকরা জমিতে অসংখ্য ছোট ছোট চাষী প্রজা অক্লান্ত পরিশ্রম করিত। তবে সামন্তগণ বাহিরের বিপদ হইতে প্রজাদের রক্ষা করিত। ক্রমে দেশের সর্বক্ষেত্রেই সামন্ততন্ত্রের প্রভাব দেখা দিয়াছিল। তৎকালীন চার্চের গঠনেও আমরা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রভাব দেখিতে পাই। দেশের অনেক জমিজমা তখন চার্চ ও মঠগুলির হাতে ছিল। সামন্তগণের শক্তিও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল কারণে মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্র-আশ্রিত জীবনধারা ক্রমশ স্বাভাবিক হইয়া আসিতেছিল।

সিভালরী (Chivalry) : সামন্ততন্ত্রের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল সিভালরী বা বীরোচিত গুণাবলী। ইহা ছিল তৎকালীন সামরিক ব্যবস্থার অঙ্গস্বরূপ এবং ইহাদের সদস্যদের নাইট বলা হইত। খ্রীষ্টীয় ধর্মীয় সংস্থা, চার্চ ও

স্ত্রীলোকদের রক্ষা করা এবং অত্যাচারে জর্জরিত দুর্বল মানবের জন্য স্বার্থত্যাগই ছিল নাইটদের প্রধান কর্তব্য। প্রধানত মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে সম্রাট শার্লেমানের পিতা চার্লস মার্টেল সর্বপ্রথম এই প্রথা প্রবর্তন করেন। প্রথমে ফরাসীগণ আরবদের নিকট হইতে অশ্বারোহী বাহিনীর উপযোগিতা সম্পর্কে শিক্ষালাভ করিয়াছিল। বস্তুত ফরাসী সেভ্যাল (Cheval) শব্দ হইতেই সিভালরী নামের উৎপত্তি হইয়াছিল। সেভ্যাল অর্থে অশ্ব বুঝাইত। যাহা হউক, দক্ষিণ ফ্রান্স হইতে এই নূতন সামরিক পদ্ধতি সমগ্র ইওরোপে ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু কালক্রমে ইহা সামন্ত-প্রথা বহির্ভূত হইয়া পড়ে, কারণ সিভালরীর অন্তর্ভুক্ত সদস্যবর্গের অনেকেরই ভূ-সম্পত্তির সহিত কোনরূপ সম্পর্ক না থাকিলেও চলিত।

নাইট ঃ ইওরোপের সর্বত্র সিভালরীর মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে সমসাময়িক অভিজাত বংশের পুত্রগণ সকলেই নাইট হইবার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিল, তবে তাহাদের ভিতর কেহ কেহ চার্চেও যোগ দিত। নাইট হইবার জন্য সামন্ত পুত্রগণের বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করিতে হইত। অপেক্ষাকৃত গরীব সামন্তদিগের পুত্রগণ প্রথমে যে-কোন খ্যাতনামা সামন্তের পরিবারবর্গের সহিত বসবাস করিত। সাত বৎসর বয়সে শিক্ষারম্ভ হইত। তখন তাহাকে পেজ নামে অভিহিত করা হইত। এইভাবে চৌদ্দ বৎসরে উত্তীর্ণ হইলে তাহাকে 'স্কোয়ার'রূপে অস্ত্রচালনা, অস্ত্রক্ষেপণ, শিকার প্রভৃতিতে যোগ্যতা অর্জন করিতে হইত। একুশ বৎসর বয়সে স্কোয়ার যোগ্যতাবলে 'নাইট' উপাধি পাইত। এক বিশেষ পদ্ধতি ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই উপাধি প্রদান করা হইত। এই কারণে নাইট পদপ্রার্থী ব্যক্তিকে প্রথামত উপবাস করিয়া নাইটের কর্তব্য সম্পর্কে সুদীর্ঘ বক্তৃতা শুনিতে হইত। অতঃপর যে সামন্তপ্রভু এই অভিষেক ক্রিয়া পরিচালনা করিতেন তাঁহার সম্মুখে নতজানু হইয়া প্রতিজ্ঞা করিতে হইত যে, নাইট হইয়া সে ধর্মীয় ব্যবস্থা ও স্ত্রীলোকদের রক্ষা করিবে, অত্যাচারিত মানবদিগের ত্রাণকার্যে ব্রতী হইবে এবং দলভুক্ত নাইটদের বিশ্বস্ত অনুচর হইয়া কাজ করিবে। তাহাকে তখন তাহার পোশাক-পরিচ্ছদ দেওয়া হইত এবং সেই সময় তাঁহার সামন্তপ্রভু নাইট পদ-প্রার্থীর স্কন্ধদেশে তরবারি

স্থাপন করিয়া বলিতেন "....তোমাকে আমি নাইট করিতেছি, তুমি বীর, সাহসী এবং প্রভুভক্ত হও।"

ট্রবেডোরস্ ঃ মধ্যযুগের নাইটগণের ভিতর একদল ভ্রাম্যমাণ কবি হিসাবে সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। প্রধানত নাইটদের লইয়া গঠিত ভ্রাম্যমাণ কবিদের ভিন্ন ভিন্ন দল তৎকালীন সমাজে ট্রবেডোরস্ (Troubadours) নামে পরিগণিত হইয়াছিল। ঐ সময় নারীর প্রতি ভালবাসা বা প্রেম প্রদর্শন নাইটদের পক্ষে বীরোচিত কাজ বা অন্যতম শিষ্টাচাররূপে স্বীকৃতি অর্জন করিয়াছিল। ফলে তৎকালীন ভ্রাম্যমাণ কবিগণ নাইটগণের প্রেমকে কেন্দ্র করিয়া গীতিকাব্য রচনা করিতেন এবং সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন রাজদরবারে গাহিয়া শুনাইতেন। সাধারণের ভিতর প্রচলিত ভাষায় রচিত নাইটদের প্রেম-গাথা স্বভাবতই ক্রমশ জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছিল।

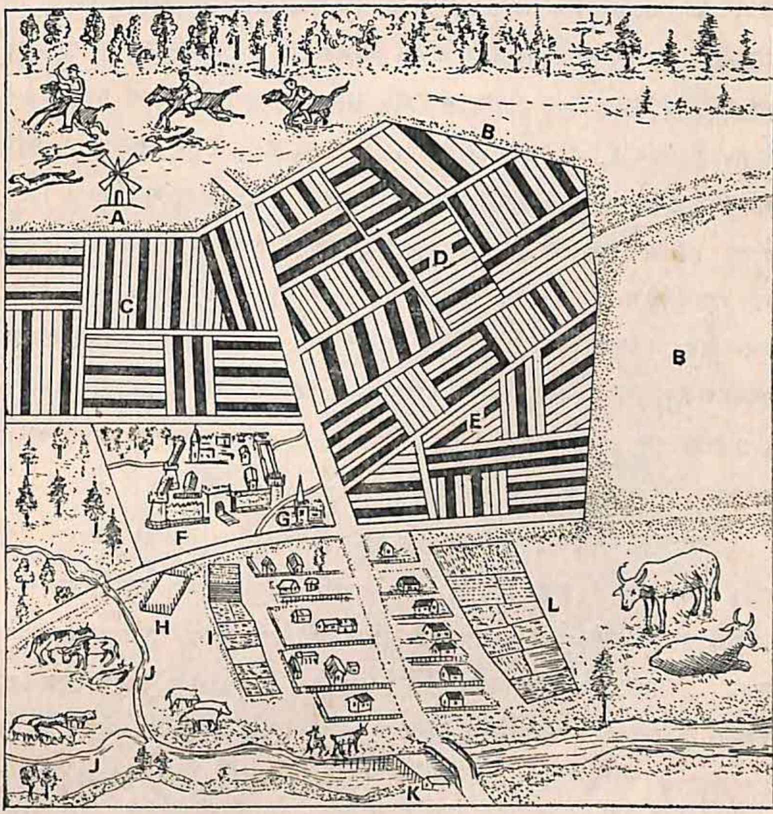
ম্যানর বা জমিদারী বন্দোবস্ত

সূচনা ঃ গ্রামের কৃষক সমাজের সাহায্যে জমি চাষের ব্যবস্থা মধ্যযুগে ম্যানরিয়ালিজম নামে অভিহিত হইত। যে-কোন একটি গ্রাম এবং কোন কোনও ক্ষেত্রে অনেকগুলি গ্রাম লইয়া এক-একটি ম্যানর গঠিত হইত।

সামন্ততান্ত্রিক যুগে জমিই ছিল আয়ের প্রধান উৎস এবং সেইমত কৃষিকার্যের উন্নতির জন্যই ম্যানর গঠিত হইয়াছিল। ইহাকে সামন্ত প্রথার অন্তর্গত স্থানীয় প্রশাসনকেন্দ্ররূপেও গণ্য করা হইত। মূলত ইহা ছিল সে-যুগের জমিদারী বন্দোবস্ত। প্রত্যেক গ্রাম বা ম্যানর বেশ সুসংবদ্ধ ছিল। ম্যানরের মধ্যস্থলে সামন্তপ্রভুর বাসগৃহ, চার্চ, মিল, রুটির কারখানা প্রভৃতির অবস্থান ছিল। সেখানে রাস্তার দুই পাশে বেশ কিছু ঘর-বাড়ি শোভা পাইত। নিকটস্থ নদী হইতে সেখানকার অধিবাসিগণের জন্য এবং প্রধানত মিল চালাইবার জন্য জল সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা হইত। কিন্তু দূরে কৃষিক্ষেত্র এবং আরও কিছু দূরে তৃণভূমি ও গোচারণ ভূমি থাকিত। ইহা ছাড়া কৃষিক্ষেত্র ও তৃণভূমি অতিক্রম করিলে পতিত জমি ও অরণ্যের সন্ধান পাওয়া যাইত। অরণ্যে শিকার এবং পতিত জমিতে শূকর পালন করা চলিত।

স্থানীয় প্রশাসনিক কেন্দ্র

জমিদারের কাছারি ঃ গ্রামের গীর্জা-প্রাঙ্গণ বা সামন্তপ্রভুর বাসগৃহের কোন বড় ঘর অথবা বাহিরে কোন বৃক্ষতলে সামন্তপ্রভুগণের কাছারি বসিত। কাছারিতে গ্রামের প্রতিটি লোকের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক ছিল।



একটি আদর্শ ম্যানরের নক্সা

A—বাতচক্র ; B—পতিত জমি ; C—বসন্তকালীন আবাদী জমি ; D—অনাবাদী জমি ; E—শীতকালীন আবাদী জমি ; F—সামন্তপ্রভুর বাসগৃহ ; G—গীর্জা ; H—পশুচারণ ভূমি ; I—সবজি বাগান ; J—নদী ; K—জলচক্র ; L—সবজি বাগান।

সেখানে জমিজমা-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হইত। গ্রামের লোকজনদের কাছারিতে উপস্থিত থাকিয়া জমিদারকে সেখানে প্রচলিত প্রথা সম্পর্কে অবহিত করিতে হইত, প্রথা-বহির্ভূত কাজের জন্য সকলকে শাস্তি

ভোগ করিতে হইত, এমন কি, জমিদারেরও নিষ্কৃতি ছিল না। পরবর্তী কালে প্রচলিত প্রথাগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়, কালক্রমে অপরাধের জন্য কাছারিতে জরিমানা আদায় জমিদারদের আয়ের অন্যতম উৎসে পরিণত হইয়াছিল।

অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রধান আর্থিক বিশেষত্ব হইল এই যে, উৎপাদনের প্রায় গোটা ক্ষেত্র জুড়িয়া ছিল কৃষিকার্য। প্রত্যেক গ্রামেই চাষযোগ্য ভূমি ছিল, একজন সামন্তপ্রভুর আবাদযোগ্য জমির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ তাঁহার খাস দখলে থাকিত, অবশিষ্ট অংশ চাষীদের ভিতর বিলি-বণ্টন হইত। কৃষকদের জমিগুলি খণ্ড খণ্ড ভাবে ছড়াইয়া থাকিত। কৃষিকার্য হইত গ্রামের সকল কৃষকের সমবেত চেষ্টায় এবং সমবায়ের ভিত্তিতে। কারণ কোন একজন কৃষকের পক্ষে কৃষিকর্মে অপরিহার্য সমস্ত কিছু যোগাড় করা সম্ভব ছিল না, যাহার লাঙল ছিল তাহার গরু ছিল না, এমন কি, তখনকার বলদগুলিও ছিল খুবই দুর্বল এবং সেই কারণে গ্রামের সমস্ত বলদ একসঙ্গে জুড়িয়া জমিতে লাঙল দেওয়া হইত। শস্য কাটিবার সময় ঐরূপ সম্মিলিত প্রচেষ্টার দরকার হইত। চাষের কাজ শেষ হইলে জমিগুলি গ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তির পশুচারণ ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইত।

কৃষকের জীবন ঃ সামন্তপ্রভুদের বাসস্থলের সন্নিহিত অঞ্চলে তাঁহাদের মালিকানাভুক্ত বিস্তৃত জমিতে গ্রামীণ কৃষিসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল। বস্তুত চাষের কাজে ক্ষেত-মজুর সংগ্রহই ছিল সামন্ততান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য। প্রভুর খাস জমিতে বিনা পারিশ্রমিকে এবং প্রয়োজনে অন্যান্য কাজও কৃষকদের করিয়া দিতে হইত। জমিদারের রাস্তা বা সাঁকোয় চড়িলে কর দিবার রীতি ছিল। ইহা ছাড়া জমিদারের মিল বা জাঁতাকলে গম ভাঙ্গিতে হইলে বা রুটি সেঁকা উনুনে রুটি সেঁকিতে হইলে কৃষকদের রীতিমত মূল্য দিতে হইত। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, কৃষকদের ক্ষেত্রে জমিদারের জাঁতাকল বা রুটির কারখানা ব্যবহার করা ছিল বাধ্যতামূলক। সে-যুগের সামন্তপ্রভুদের কাছারিতে পাওয়া কাগজপত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কৃষকগণ সামন্তপ্রভুদের একচেটিয়া কারবারের বিরোধিতা করিত। কারণ গম ভাঙা বা রুটি সেঁকার কাজ তাহারা আপন আপন ঘরে নিজেরাই করিতে পারিত। অধিকন্তু কৃষকদের জীবন ছিল একঘেয়ে, কষ্টকর ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন।

সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাহাদের পরিশ্রম করিতে হইত। সমসাময়িক ইওরোপে বিভিন্ন চার্চের এক্তিয়ারভুক্ত অনেক জমিদারী ছিল। এই সকল ধর্মীয় ভূ-সম্পত্তিও সামন্ততান্ত্রিক-পদ্ধতিতে পরিচালিত হইত। কৃষকগণের উপর অন্যান্য করের বোঝা তো ছিলই, কিন্তু সেই সঙ্গে চার্চকে টাইথ বা ধর্মীয় কর দিতে হইত।

সামন্তগণের গ্রামীণ প্রাসাদ ও জীবনধারা : সামন্তগণ তাহাদের ভূ-সম্পত্তির মধ্যবর্তী এলাকায় বেশ উঁচু জায়গায় প্রাসাদ বা দুর্গ নির্মাণ করিতেন। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে নিজেদের ও প্রজাদের সুরক্ষার



গ্রামীণ প্রাসাদ

প্রয়োজনে প্রাসাদগুলি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিত। অধিকাংশ প্রাসাদই ছিল ত্রিতলবিশিষ্ট এবং ইহার নিকটবর্তী কৃষকদের কুঁড়ে ঘরের তুলনায় প্রাসাদগুলি ছিল যেমন বিলাসবহুল তেমনি আরামপ্রদ। এই সকল প্রাসাদের একতলায় সুবৃহৎ বৈঠকখানা, শয়নাগার এবং ভৃত্যদের বাসের নিমিত্ত

কক্ষ থাকিত। বৈঠকখানার সহিত আগুন জ্বালাইবার জায়গা, খাদ্যসামগ্রী রাখিবার জন্য আলমারি, ভাণ্ডার-গৃহ প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট ছিল। ইহা ছাড়া ছিল অভ্যর্থনাগৃহ যাহা প্রার্থনা-গৃহরূপেও ব্যবহৃত হইত। প্রাসাদে আসবাবপত্রের প্রাচুর্য ছিল না। টেবিল, কতকগুলি টুল এবং দুই-একখানি মাত্র চেয়ার ছিল। বাসন-কোসনেরও তেমন প্রাচুর্য ছিল না। জল ফুটাইবার নিমিত্ত পিতলের হাঁড়ি একটি বা দুইটি এবং দুইটি বা তিনটি পিতলের ডিস থাকিত।

শ্রেণীবিভাগ ঃ সামন্ত যুগে ইওরোপের সমাজ তিনটি নির্দিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, যথা—অভিজাত শ্রেণী, পুরোহিত শ্রেণী এবং বাকী সাধারণ লোক লইয়া গঠিত 'মজুর শ্রেণী'। তদানীন্তত সমাজব্যবস্থায় প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট কাজকর্ম ছিল, অভিজাত শ্রেণী অর্থাৎ সামন্তগণের প্রধান কাজ ছিল এলাকাভুক্ত জনগণের নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং স্থানীয় শান্তি বজায় রাখা। পুরোহিত বা যাজকগণ সকলের জন্য প্রার্থনা করিতেন এবং আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য যথারীতি চেষ্টা করাই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। আর সমাজের সকলের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুর যোগান দেওয়া সাধারণ শ্রেণী অর্থাৎ কৃষক ও কারিগরদের প্রধান দায়িত্ব ছিল। কিন্তু কৃষক ও কারিগর ভিন্ন উচ্চ শ্রেণীর কেহই তাঁহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে তেমন সচেতন ছিলেন না। সাধারণ শ্রেণীর পক্ষে কর্তব্যে গাফিলতি করিবার কোন উপায় ছিল না। কারণ তখনকার ধর্মীয় তত্ত্ব অনুযায়ী এই শ্রমবিভাজন ব্যবস্থা ছিল ঈশ্বর-নির্দিষ্ট। সুতরাং কৃষকদের কি কি কাজ করিতে হইবে তাহা ছিল খুবই সুস্পষ্ট। বস্তুত যে-কোন অবস্থাতেই অভিজাত শ্রেণীর সেবা করাই ছিল তাহাদের প্রধান কাজ। তাই তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থায় অভিজাতগণ ছিলেন 'হুজুর শ্রেণী' আর কৃষক বা কারিগর 'মজুর শ্রেণী' নামে অভিহিত হইত।

ভূমিদাস ঃ বিধিসম্মতভাবে ভূমিদাস ছিল সামন্তপ্রভুর অস্থাবর সম্পত্তির অন্তর্গত। সামন্তপ্রভুর অধিকারে যেমন গরু, ভেড়া, শূকর, ঘোড়া প্রভৃতি গৃহপালিত পশু-সম্পত্তি ছিল সেইরূপ ছিল ভূমিদাসেরা। বিধিমত সে কোন সম্পত্তির মালিক হইতে পারিত না, সে কোন বিচারালয়ে হাজির হইয়া অন্য কোন ভূমিদাসের বিরুদ্ধে মামলা করিতে পারিত না। এমন কি, আইনত না হইলেও

সামন্তপ্রভুদের অস্থাবর সম্পত্তি

কার্যত ভূমিদাসদের ক্রীতদাসদের মত বিক্রয়ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল। তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছার কোন মূল্য ছিল না। নিজ নিজ সামন্তপ্রভুর এলাকা বর্জনপূর্বক অন্যত্র বৃত্তির অন্বেষণ বা বসতি স্থাপনের অধিকার ভূমিদাসদের ছিল না।

দায়-দায়িত্ব

এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, ভূমিদাসদের জীবনে কোন আনন্দ ছিল না। সামন্তপ্রভুগণ ভূমিদাসদের নিকট হইতে নানা খাতে পাওনা ও পারিশ্রমিক আদায় করিতেন। ইহা ছাড়া সামন্তপ্রভুদের খাস জমি ও গৃহকর্মে বা অন্যান্য ক্ষেত্রে শ্রমদান ভূমিদাসদের পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল।

জন্মসূত্রে ভূমিদাস

সামন্তযুগে চাষীদের ভিতর অনেকেই জন্মসূত্রে ভূমিদাস হইত, কারণ ভূমিদাস ব্যবস্থায় উত্তরাধিকার রীতি বলবৎ ছিল। এমন কি, একজন ভূমিদাসের সহিত কোন 'স্বাধীন' রমণীর বিবাহ হইলেও তাহাদের সন্তান সচরাচর ভূমিদাসরূপেই গণ্য হইত।

ভূমিদাস শ্রেণীর পলায়ন ও বিদ্রোহ

একাদশ শতাব্দীতে ইওরোপের গ্রামগুলি হইতে ভূমিদাস শ্রেণী ব্যাপক হারে পলায়ন শুরু করে। ইতিমধ্যে অবশ্য ভূমিদাস ব্যবস্থা হইতে মুক্তিলাভের নানা পন্থা বাহির হইয়াছিল। প্রথামত ভূমিদাসেরা তাহাদের মালিকের অনুমতি লইয়া ধর্মীয় সংস্থায় যোগ দিতে পারিত। ইহা ছিল বিধিসম্মত পন্থা। কিন্তু এই বিধি লঙ্ঘন করিয়াও অনেকে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল। এই সময় শহরগুলিতে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ঘটায় সহজেই সেখানে কাজ জুটিত। ইহা ছাড়া মুক্তির জন্য ভূমিদাসগণ বিদ্রোহও করিত বা বিদ্রোহের হুমকি দিত। এই প্রসঙ্গে ১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের 'জাকেরি'-বিদ্রোহ ও ১৩৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে টাইলারের নেতৃত্বে চাষী-বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য। বস্তুত দীর্ঘকালব্যাপী তুমুল বিরোধ ও বারংবার বিদ্রোহের মধ্য দিয়া ভূমিদাসপ্রথা ক্রমশ ঐতিহাসিক বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হইতে থাকে।

প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক ঃ

১। "সামন্ত প্রথা" বলিতে কি বুঝ ? এই প্রথার মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।

২। মধ্যযুগের যুদ্ধ-বিগ্রহে সামন্তদের প্রাসাদদুর্গ ও বর্মাবৃত অশ্বারোহী বাহিনীর ভূমিকা আলোচনা কর।

৩। সামন্ততন্ত্র আশ্রিত জীবনধারা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখ।

৪। "সিভালরী" বলিতে কি বুঝ? কিভাবে মধ্যযুগে নাইট হইবার জন্য প্রশিক্ষণ লইতে হইত?

৫। "ম্যানর" বলিতে কি বুঝ? একটি আদর্শ 'ম্যানরে'র বর্ণনা দাও।

৬। সামন্তযুগে কৃষকদের জীবনযাত্রা বর্ণনা কর।

৭। সামন্তদের গ্রামীণ প্রাসাদে জীবন যাপন সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৮। সামন্ত-প্রথাভুক্ত ভূমিদাসদের সামাজিক অবস্থা বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক ঃ

(ক) সামন্ততন্ত্রে ক্রমোচ্চ স্তরভেদ কিরূপ ছিল? (খ) সামন্তগণ কি স্ব স্ব এলাকায় স্বাধীন ছিলেন? (গ) সানন্তদের প্রাসাদদুর্গ বলিতে কি বুঝ? (ঘ) বর্মাবৃত অশ্বারোহী বাহিনীর উপযোগিতা কি ছিল? (ঙ) "সিভালরী" কথাটির অর্থ কি? (চ) কাহারা নাইট হইতেন? (ছ) "ম্যানর" বলিতে কি বুঝ? একটি আদর্শ "ম্যানরে" কি কি থাকিত? (জ) জমিদারের কাছারি কোথায় বসিত এবং সেখানে কি কি আলোচিত হইত? (ঝ) সামন্ত যুগে কৃষকগণ কিভাবে জমি চাষ করিত। (ঞ) সামন্ততন্ত্রে ভূমিদাসদের অবস্থা কিরূপ ছিল? (ট) "ট্রবেডোরস" কাহাদের বলা হইত?

এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(১) সামন্ততন্ত্রে প্রকৃত ক্ষমতা কাহাদের হস্তে ছিল? (৩) কি জন্য সামন্তগণ প্রাচীরবেষ্টিত প্রাসাদদুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন? (৩) সামন্তগণ কি ধরনের সৈন্য গঠন করিয়া বৈদেশিক লুণ্ঠন অভিযানের মোকাবিলা করিয়াছিলেন? (৪) নাইটদের বীরোচিত গুণাবলীর কি নামকরণ করা হইত? (৫) সিভালরীর সদস্যবর্গ কি নামে অভিহিত হইতেন? (৬) সামন্তযুগের আয়ের প্রধান উৎস কি ছিল? (৭) সামন্তদের গ্রামীণ প্রাসাদে কি কি আসবাবপত্র ছিল? (৮) সামন্তযুগের সমাজ কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১। সামন্তযুগে জমিতে দেশের রাজা হইতে শুরু করিয়া ধাপে ধাপে বিভিন্ন স্তরের সামন্তবর্গ এবং সর্বনিম্নে — বহুতর স্বত্বের সমাবেশ ঘটিত ; ২। — আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে শার্লেমানের পিতা — প্রথা প্রবর্তন করেন ; সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় অভিজাতগণ ছিলেন — আর কৃষক ও তথাকথিত নিম্নশ্রেণীরা — শ্রেণী নামে অভিহিত ছিল ; ৪। বিধি-সম্মতভাবে ভূমিদাস ছিল সামন্তপ্রভুর — সম্পত্তি।

অষ্টম অধ্যায়

মধ্যযুগের ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেড

সূচনা ঃ প্যালেস্টাইনের পবিত্র স্থানগুলি (যীশুখ্রীষ্টের জন্মস্থান বা সমাধিক্ষেত্র) তুর্কী মুসলমানদের হাত হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের দুইশত বর্ষব্যাপী যুদ্ধ ও প্রচেষ্টাই ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ নামে পরিচিত।

ধর্মযুদ্ধের কারণ ঃ খ্রীষ্টানদের পবিত্র-ভূমির রাজধানী জেরুজালেম আরবদের অধিকারে ছিল এবং ধর্মপ্রাণ খ্রীষ্টানগণ সেখানে তীর্থ করিয়া



ক্রুসেডের সৈন্য সমাবেশ

নির্বিঘ্নে দেশে ফিরিত। কিন্তু ১০৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আরবদের অপেক্ষা আরও হিংস্র ও নিষ্ঠুর তুর্কী মুসলমানগণ জেরুজালেম দখল করিয়াছিল, ফলে খ্রীষ্টানদের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার আরম্ভ হইল। কথিত আছে যে, ফ্রান্সের পিটার নামে একজন সন্ন্যাসী প্যালেস্টাইন হইতে ফিরিয়া ছিন্ন বস্ত্রে ও নগ্ন পদে, গাধায় চড়িয়া ফ্রান্স ও জার্মানীর গ্রামাঞ্চলে ও নগরগুলিতে ঘুরিতে থাকেন। তিনি এইভাবে খ্রীষ্টানদের উপর মুসলমানদের

অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করিয়া ধর্মযুদ্ধের জন্য ইওরোপকে প্রথম উদ্দীপিত করেন। এদিকে তুর্কীদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া রাজধানী কনস্টান্টিনোপল রক্ষার প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে পূর্ব রোমান সম্রাট পোপের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই আবেদনে সাড়া দিয়া পোপ দ্বিতীয় উর্বান ফ্রান্সের ক্লেরমন্ট শহরে সভা আহ্বান করেন। বস্তুত প্রথম ক্রুসেডের প্রকৃত উদ্যোক্তা ছিলেন পোপ দ্বিতীয় উর্বান। ধর্মযুদ্ধ আহ্বানের ক্ষেত্রে পোপের উদ্দেশ্য ছিল খুবই সুস্পষ্ট। ইতিমধ্যে ইওরোপের অধিকাংশ স্থানে পোপের সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এক্ষণে একটি মহান আন্তর্জাতিক আন্দোলনের পুরোভাগে থাকিয়া পোপ ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছিলেন যে, তিনিই খ্রীষ্টীয় জগতের প্রধান, জার্মান সম্রাট নহেন।

সামন্তপ্রভু, ব্যবসায়ী বা কৃষককুলের যোগদানের কারণ : কিন্তু পোপ চাহিলেও সে-যুগের সামন্তপ্রভু বা নাইটগণ কিংবা ব্যবসায়ী ও কৃষকগণ কি উদ্দেশ্যে ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল ? মূলত ধর্মীয় বিষয় প্রাধান্য পাইলেও এই ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত সকলের কিন্তু একই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছিল না। বস্তুত মধ্যযুগের মানুষের পাপবোধ বেশ গভীর ছিল। তাই তাহারা সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য স্বেচ্ছায় যে-কোন কষ্টকর কাজে লিপ্ত থাকিতে চাহিত। প্রায়শ্চিত্তের জন্য মঠচারী হইলে চলিত, কিন্তু অনেকের পক্ষেই মঠের কঠোর নিয়ম-কানুন পালন করিয়া মঠচারী হওয়া অসম্ভব ছিল। সেই কারণে অনেকেই তখন পবিত্রভূমিতে তীর্থযাত্রা করিয়া পাপমুক্ত হইতেন। তাই সংক্ষেপে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধকে অসাধারণ তীর্থযাত্রা (super pilgrimages) বলিয়া অভিহিত করা চলে। ইহা ছাড়া ইতিমধ্যে সামন্ততান্ত্রিক ইওরোপে জনসংখ্যার চাপ দেখা দিয়াছিল। ফলে নাইটগণের ভিতর অনেকেই, বিশেষত সামন্তগণের কনিষ্ঠ সন্তানগণ ভূমিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমতাবস্থায় প্রাচ্য দেশের সমৃদ্ধি-সংক্রান্ত প্রবাদে আকৃষ্ট হইয়া অনেকেই লুণ্ঠনের অভিপ্রায়ে তথা জমি-জায়গা পাইবার লোভে ক্রুসেডে লিপ্ত হইয়াছিল। এই সকল অভিযানে ইতালির বণিক সম্প্রদায়ও নানাভাবে সাহায্য-সহায়তা করিয়াছিল। তাহারা স্বভাবতই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেই আগাইয়া আসিয়াছিল। তাহারা নিকট প্রাচ্যে খ্রীষ্টান-অধ্যুষিত বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপনে আগ্রহী ছিল।

সাধারণ লোকদের মধ্যে অনেকেই অবশ্য লুটপাটের আশায় ক্রুসেডে লিপ্ত হইয়াছিল।

ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেড ঃ মোট আটটি ক্রুসেড হইয়াছিল। তবে এগুলির মধ্যে প্রথম চারিটি ক্রুসেড বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১০৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ক্রুসেডের জন্য সৈন্য সমাবেশ হয় এবং পরবৎসর যোদ্ধৃগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া কনস্টান্টিনোপলে সমবেত হয়। এই যুদ্ধে খ্রীষ্টানদের জয় হইয়াছিল। ফলে জেরুজালেম সহ অপর কয়টি রাজ্য খ্রীষ্টানদের অধিকারে আসে। এই সকল বিজিত স্থান লইয়া সিরিয়ায় 'জেরুজালেম রাজ্য' গঠিত হয়। দ্বিতীয় ক্রুসেডে (১১৪৭-৪৯ খ্রীঃ) খ্রীষ্টানদের পরাজয় ঘটে এবং সেই কারণে জেরুজালেম রাজ্যের পতন হয়।

জেরুজালেম রাজ্য গঠন

তৃতীয় ক্রুসেড (১১৮৯-৯১ খ্রীঃ) ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য, কারণ ইহাতে জার্মান সম্রাট ফ্রেডারিক বার্বারোস্সা, ফ্রান্সের দ্বিতীয় ফিলিপ ও ইংলণ্ডের প্রথম রিচার্ড অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইওরোপের ধর্মীয় ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ পোপ তৃতীয় ইনোসেন্টের আগ্রহে চতুর্থ ক্রুসেড (১২০২-০৪ খ্রীঃ) সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে যোগদানকারী অধিকাংশ যোদ্ধৃগণ ছিলেন ফরাসী নাইটবৃন্দ। ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে যোদ্ধৃগণ ভেনিশ শহরে সমবেত হয়। এই যুদ্ধে ভেনিসের বণিকগণ রণতরী ও রসদ যোগাইয়াছিল। কিন্তু তাহার বিনিময়ে তাহারা ধর্মযোদ্ধাদের সাহায্যে জারা নামক প্রতিদ্বন্দ্বী বাণিজ্য নগরী ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিল। ফলে এই চক্রান্তে লিপ্ত হইয়া ধর্মযোদ্ধৃগণ জারা নগরী আক্রমণ ও দখল করে। ইহাতে ইওরোপের সকলেই সচকিত ও বিস্মিত হইয়া উঠে কারণ জারা ছিল একটি খ্রীষ্টান-অধ্যুষিত নগরী।

ফলাফল ঃ সভ্যতার ইতিহাসে ক্রুসেড একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইওরোপের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশে ক্রুসেডের প্রভাব অনস্বীকার্য। প্রথমত, ক্রুসেডের প্রভাবে ইওরোপের শহর ও গ্রামগুলির সাধারণ লোকের মুক্তির পথ ত্বরান্বিত হইয়াছিল। ভূমিদাস শ্রেণীর অনেকেই দাসত্বের বন্ধন হইতে

সাধারণ লোকের মুক্তি

মুক্ত হইল, কারণ ক্রুসেড তাহাদের সেই সুযোগের সৃষ্টি করিয়াছিল। দ্বিতীয়ত, এই সময় স্ত্রীজাতির মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কারণ গৃহস্বামিগণ ধর্মযুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় তাহাদিগকেই বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনা করিতে হইত। তৃতীয়ত, ইওরোপের লোকজনের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল। আরব দেশে প্রচলিত বস্ত্রের মধ্যে পর্দা, কম্বল, সার্টিন, মখমল প্রভৃতি ইওরোপে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। ইহা ছাড়া বিলাসদ্রব্যের মধ্যে গন্ধদ্রব্য, পাউডার, আয়না প্রভৃতি আরবদের অনুকরণে প্রচলিত হইতে লাগিল।

স্ত্রীজাতির মর্যদা বৃদ্ধি

ক্রুসেডের ফলে ইওরোপের উপর গ্রীক ও মুসলমান সংস্কৃতির সরাসরি প্রভাব তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। তবে সাহিত্য ও কলার উন্নতি হইয়াছিল। বহু আরবী শব্দ ইওরোপীয় ভাষার সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। প্রাচ্যের অনেক গল্প-গাথা ইওরোপে প্রচলিত হইয়াছিল। অনেক রোমাঞ্চকর অভিযানের কাহিনী ক্রুসেডে যোগদানকারী যোদ্ধাদের মুখ হইতে শুনিয়া তৎকালীন লেখকগণ গল্পে ও গানে বিবৃত করিতে থাকেন। ফলে ইউরোপের অভিজাত মহলে এক নূতন ধরনের জনপ্রিয় সাহিত্যের জন্ম হইয়াছিল।

ক্রুসেড ইওরোপের নগরগুলির বিকাশ তরান্বিত করিয়াছিল। ক্রুসেডের জন্য ভেনিস, জেনোয়া, পিসা, মিলান প্রভৃতি বাণিজ্য-প্রধান শহরগুলির শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। কারণ এই মহাযুদ্ধের জন্য খাদ্য, অস্ত্র ও যানবাহন যোগাইয়া ঐ শহরগুলির বণিকগণ প্রভূত সম্পদ সঞ্চয় করে।

নূতন নূতন শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র

ইতিপূর্বে শহরের কারিগরি শিল্পীরা প্রধানত স্থানীয় কৃষি-অর্থনীতির ক্ষুদ্র কাঠামোয় আবদ্ধ ছিল। কিন্তু ক্রুসেডের ফলে ইওরোপের মধ্য ও উত্তর ভাগে শিল্পজ পণ্য উৎপাদনের প্রসার ঘটে। কৃষি ও শিল্পের মধ্যে শ্রমবিভাগ ক্রমশ বাড়িতে থাকে। পরিশেষে কুটির-শিল্পে লিপ্ত কারিগরগণ কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

কুটির-শিল্প

প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক ঃ

১। ক্রুসেডের কারণগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২। প্রথম চারিটি ক্রুসেড সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৩। ক্রুসেডের ফলাফল কি হইয়াছিল ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক ঃ

(ক) ক্রুসেড বলিতে কি বুঝ ? (খ) সন্ন্যাসী পিটার কিভাবে ইওরোপকে ধর্ম-যুদ্ধের জন্য উদ্দীপিত করেন ? (গ) প্রথম ক্রুসেডের উদ্যোক্তা কে ছিলেন এবং কি কারণে তিনি ক্রুসেডে লিপ্ত হইয়াছিলেন ? (ঘ) কি জন্য নাইটগণ ও অন্য সকলে ক্রুসেডে যোগ দিয়াছিলেন ? (ঙ) তৃতীয় ক্রুসেড কি কারণে গুরুত্বপূর্ণ ? (চ) কিভাবে চতুর্থ ক্রুসেডের সূচনা হইয়াছিল ? (ছ) ক্রুসেডের ফলে ভূমিদাস ও স্ত্রীলোকদের অবস্থার কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছিল ? (জ) ক্রুসেডে লিপ্ত হইয়া ইতালি ও ভেনিসের বণিকদের কি শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল ?

এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(১) প্যালেস্টাইন কাহাদের দখলে চলিয়া যাওয়াতে ক্রুসেডের সূচনা হইয়াছিল ? (২) দ্বিতীয় উর্বাণ কে ছিলেন ? (৩) প্রথম ক্রুসেডে কাহাদের জয় হইয়াছিল ? (৪) ইনোসেণ্ট কে ছিলেন এবং তিনি কোন্ ক্রুসেড আহ্বান করেন ? (৫) চতুর্থ ক্রুসেডে কাহারা রসদ ও রণতরী জোগাইয়াছিল ?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১। প্রথম ক্রুসেডের উদ্যোক্তা ছিলেন — ; ২। ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেডকে অসাধারণ — বলিয়া অভিহিত করা হয় ; ৩। — খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ক্রুসেডের জন্য সৈন্য সমাবেশ হয় ; ৪। প্রথম ক্রুসেডে বিজিত রাজ্য লইয়া সিরিয়ায় — রাজ্য গঠিত হয় ; ৫। চতুর্থ ক্রুসেডে চক্রান্তে লিপ্ত ধর্মযোদ্ধগণ — নগরী আক্রমণ করে ; ৬। ক্রুসেডের প্রভাবে সাধারণ লোকের — পথ তরান্বিত হইয়াছিল।

———

নবম অধ্যায়

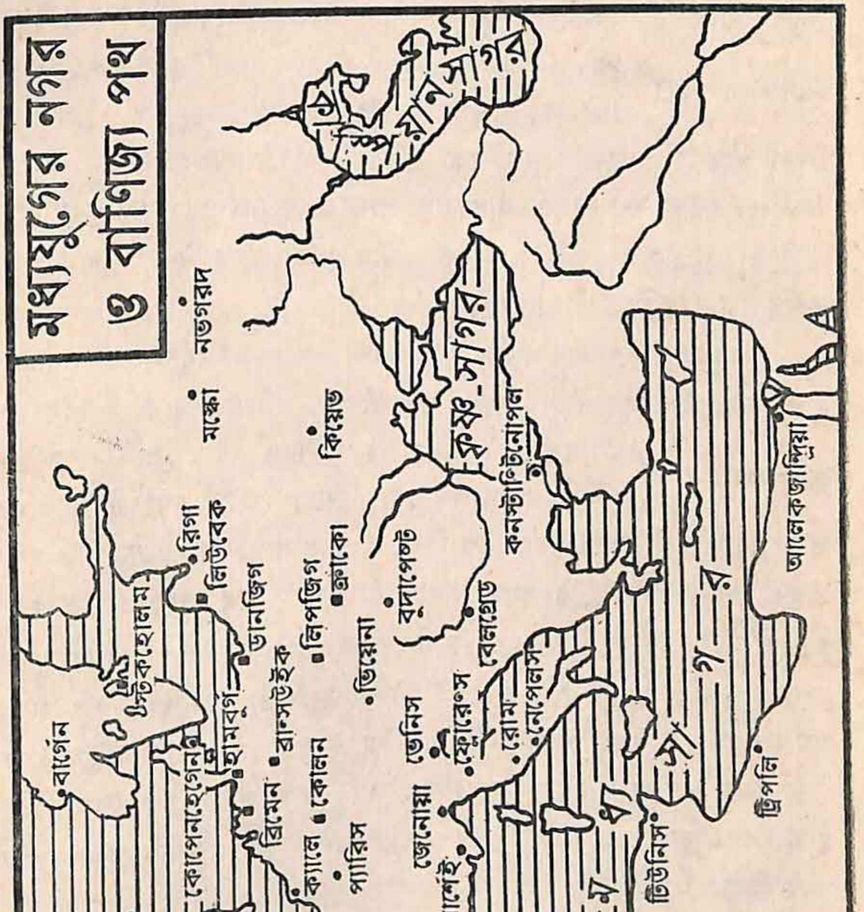
শহরের উত্থান

সূচনা ঃ রোমান সভ্যতার যুগে শহরাঞ্চলের প্রাধান্য ছিল। তখন ব্যবসায়-বাণিজ্যের খুব উন্নতি হইয়াছিল, ফলে বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে শহরগুলির শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতেছিল, কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়-ব্যাণিজ্যের প্রসার রুদ্ধ হইলে শহরগুলির পতন অনিবার্য হইয়া উঠে। ইহা ছাড়া পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর যে সকল জার্মান জাতি ইওরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি বিস্তার করে তাহাদের কাছে রোমান নগরগুলির বিশেষ কোন মূল্য ছিল না। কৃষি-অর্থনীতি নির্ভর ঐ সকল আগন্তুকগণ গ্রামীণ সভ্যতার বাহক ছিল। অধিকন্তু সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে মুসলমান শক্তির উত্থান ঘটিলে ভূমধ্য-সাগরীয় অঞ্চলের সহিত পশ্চিম ইওরোপের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। ফলে পশ্চিম ইওরোপের সহিত বহির্জগতের যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া গেল।

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে শহরগুলির পতন—কৃষি-অর্থনীতি—মুসলমানদের উত্থান

ক্রমে বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপনের পর জার্মান জাতিসমূহ রাষ্ট্রীয় অধিকার সংস্থাপনে উদ্যোগী হইলে শাসনকেন্দ্ররূপে শহরগুলির প্রয়োজন স্বীকৃত হয়। কিন্তু পশ্চিম ইওরোপের শহরগুলির বিকাশের ক্ষেত্রে বাহির্বাণিজ্যের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সেইহেতু বহির্জগতের সহিত পশ্চিম ইওরোপের যখন বাণিজ্যিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হইল তখন হইতেই প্রকৃতপক্ষে শহরগুলির বিকাশ হইয়াছিল, এক্ষেত্রে ইতালিই উদ্যোক্তার ভূমিকা লইয়াছিল। কারণ ইতালির অন্তর্গত ভেনিস, মিলান এবং গ্রীসের অন্তর্গত এথেন্স, করিন্থ প্রভৃতি শহরগুলি বিচ্ছিন্নতার যুগেও নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের সহিত বাণিজ্যিক যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল।

বহির্জগতের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন—শহরের বিকাশ


মধ্যযুগের নগর ও বাণিজ্য পথ
নভগরদ
মস্কো
কিয়েভ
রিগা
লিউবেক
ডানজিগ
লিপজিগ
ক্রাকো
বুদাপেস্ট
বেলগ্রেড
কনস্টান্টিনোপল
কৃষ্ণ সাগর
ক্যাস্পিয়ান সাগর
ভিয়েনা
ভেনিস
ফ্লোরেন্স
রোম
নেপল্‌স
জেনোয়া
মার্সেই
প্যারিস
ক্যালে
ব্রিমেন
কোলন
ব্রান্সউইক
হামবুর্গ
কোপেনহেগেন
স্টকহোম
বার্গেন
লণ্ডন
ডাবলিন
লিসবন
কার্ডিজ
টিউনিস
ত্রিপলি
আলেকজান্দ্রিয়া
ভূমধ্য সাগর
হ্যানসিয়াটিক লীগের কেন্দ্রস্থল

একাদশ শতাব্দী হইতে ইওরোপ ক্রুসেডে লিপ্ত হয়। ঐ শতাব্দীর শেষে প্রথম ক্রুসেডের পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল উন্মুক্ত হয়। ফলে ইতালি ও গ্রীক নগরগুলির সহিত প্রাচ্যের বাণিজ্যিক লেনদেন বৃদ্ধি পায়। ভেনিস, জেনোয়া, পিসা প্রভৃতি শহরগুলি সামুদ্রিক বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিল। ইহাতে উদ্দীপিত হইয়া লম্বার্ডি ও টাসকানি প্রভৃতি স্থানের বণিকগণ অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করিতে থাকে, ক্রমে দক্ষিণ ফ্রান্স ও স্পেনে কতিপয় শহরে উত্থান দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্রুসেড-এর প্রভাব

শহরগুলির বিকাশের সহিত গিল্ড ব্যবস্থা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে নগরগুলির শ্রীবৃদ্ধি ঘটিলে নগরের কারিগর ও বণিকদের নিকট বৃত্তির ভিত্তিতে যৌথ সংগঠন গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে নগরের বণিকদের ও কারিগরদের লইয়া ভিন্ন ভিন্ন গিল্ড বা যৌথ সংগঠনগুলির সূত্রপাত হয়। প্রথম দিকে অবশ্য শহরের সমস্ত বণিক ও ব্যবসায়ীদের লইয়া বণিক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সঙ্ঘে কারিগরদেরও লওয়া হইত, কারণ মধ্যযুগের প্রথমদিকে কারিগরদের প্রায় সকলেই ব্যবসায়-বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল, কিন্তু ক্রমশ বড় বড় শহরের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি ভিন্ন ভিন্ন শিল্পে দক্ষতা অর্জন করিলে এক গিল্ডে এক-এক ব্যবসায়ী দলবদ্ধ হইয়াছিল। তাই সেই যুগে প্রত্যেক শহরে মুচি, দরজী, ছুতোর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিতে লিপ্ত কারিগরদের লইয়া পৃথক পৃথক গিল্ড গড়িয়া উঠিয়াছিল।

গিল্ড-প্রথা

গিল্ডের মাধ্যমে বিক্রয় পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হইত। এই ব্যবস্থায় শ্রমিকদের কাজের দাম ও সময় স্থির করা এবং উৎপন্ন দ্রব্যের একটি নির্দিষ্ট মান বজায় রাখা হইত। ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রত্যেক সদস্য যাহাতে সমান সুযোগ পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হইত। ইহা ছাড়া গিল্ডের মাধ্যমে পাইকারী দরে যে সমস্ত কাঁচামাল খরিদ করা হইত তাহাতে প্রত্যেক সদস্যের সমান অংশ থাকিত। গিল্ডের সদস্যদের যাহাতে ক্ষতি না হয় সেইজন্য পারস্পরিক প্রতিযোগিতা হইতে তাহাদের নিবৃত্ত করা হইত। ইহা ছাড়া গিল্ডের সদস্যবর্গের পারস্পরিক সহযোগিতা

গিল্ডের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়

বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কতকগুলি নিয়ম পালন করা হইত। ফলে কোন একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হঠাৎ কোন অসুবিধায় পড়িলে অন্যান্য সদস্যদের তাহাকে সাহায্য করা বাধ্যতামূলক ছিল। অধিকন্তু গিল্ডগুলি কিছু সামাজিক ও ধর্মমূলক কাজকর্মেও লিপ্ত ছিল। ফলে প্রত্যেক গিল্ডে একটি পৃথক ধাঁচের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন গড়িয়া উঠে। এই প্রসঙ্গে মধ্যযুগের হান্সিসিয়াটিক লীগের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

শহরের জীবনযাত্রার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ মধ্যযুগের শহরগুলি আয়তনে ছিল ক্ষুদ্র। শহরের প্রবেশ পথে ফটক ছিল এবং সমগ্র শহর প্রাচীরবেষ্টিত থাকিত। এক ফটক হইতে অন্য ফটক বরাবর গাড়ী চলিবার উপযোগী রাস্তা ছিল। কিন্তু অধিকাংশ রাস্তাই ছিল সংকীর্ণ এবং আকা-বাঁকা। এদিকে এই সংকীর্ণ রাস্তার উপর সুউচ্চ বাড়ি থাকিবার ফলে রাস্তাগুলি আরও সংকীর্ণ দেখাইত।

রাস্তাঘাট ও ঘর-বাড়ি



শহরের রাস্তা ও বাজার

রাস্তাঘাটে অসতর্কভাবে আবর্জনা নিক্ষেপের ফলে জীবনযাপন ক্রমেই অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছিল। রাস্তায় বহুসংখ্যক কুকুর ও শূকর ঘুরিয়া

বেড়াইত তবে তাহারা রাস্তার আবর্জনা খাইয়া কিছুটা উপকার করিত। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার যথেষ্ট অভাব ছিল। যে শহরের নিকটে নদী ছিল না সেখানে জলাশয় ও কূপগুলির সাহায্যে জল সরবরাহ করা হইত। ইহা ছাড়া তখনকার জনাকীর্ণ শহরগুলিতে উন্মুক্ত স্থানের বড়ই অভাব ছিল। ফলে আবহাওয়া ছিল দূষিত ও অস্বাস্থ্যকর।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব

মধ্যযুগের শহরগুলির অধিবাসিগণ তাহাদের নিজ নিজ এলাকার রাজা বা সামন্তপ্রভুর শাসন মানিয়া চলিত এবং নিয়মিত কর দিত। কিন্তু শহরের অধিবাসিগণ ক্রমশ নানারকম অধিকার লাভে সচেষ্ট হইলে রাজা বা সামন্তগণ নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্যসম্বলিত চার্টার বা সনদ দিতেন। এইভাবে মধ্যযুগের শেষ দিকে কতিপয় শহরে স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত হয়। এই প্রসঙ্গে রোম, বার্লিন, লণ্ডন ও প্যারিস প্রভৃতি শহরগুলির স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য।

শহরগুলির চার্টার লাভ

মধ্যযুগের শহরগুলির উত্থান ও বিকাশের সহিত বুর্জোয়া শ্রেণীর উত্থান বিশেষত উল্লেখযোগ্য। মূলত ফরাসী শব্দ হইতে বুর্জোয়া কথাটির উৎপত্তি। মধ্যযুগে চার্চ ও মঠগুলিকে কেন্দ্র করিয়া অনেকগুলি শহর গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহা ছাড়া নবম ও দশম শতাব্দীর সামন্তপ্রভুদের নির্মিত দুর্গ ও প্রাসাদগুলিকে কেন্দ্র করিয়া কতিপয় শহরের উত্থান হইয়াছিল। এইগুলিকে বার্জেস নাম দেওয়া হয়। শহরগুলি প্রাচীরবেষ্টিত ছিল। এক্ষণে এই সকল প্রাচীরের বাহিরেও কিছু ব্যবসায়ী, কারিগর ও শ্রমিক শ্রেণী সংঘবদ্ধ হইয়া জীবনযাপন করিত। ফলে শহরাশ্রয়ী সমাজে একটি নূতন শ্রেণী গড়িয়া উঠিতেছিল যাহারা কালক্রমে বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী নামে পরিচিত হয়।

বুর্জোয়া শ্রেণীর উত্থান

প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক :

১। মধ্যযুগে ইওরোপের শহরগুলির উত্থানের কারণগুলি আলোচনা কর।

২। শহরগুলির উত্থানে ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিকাশে গিল্ড ব্যবস্থার গুরুত্ব নির্ধারণ কর।

৩। ইওরোপের শহরাশ্রয়ী জীবনধারা বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক ঃ

(ক) কিভাবে মধ্যযুগের সূচনায় শহরগুলির পতন হইয়াছিল ? (খ) কখন হইতে প্রকৃতপক্ষে শহরগুলির ক্রমবিকাশ হইয়াছিল ? (গ) কিভাবে ক্রুসেডের প্রভাবে ইওরোপীয় দেশগুলির প্রাচ্যের সহিত লেনদেন বৃদ্ধি পাইয়াছিল ? (ঘ) কিভাবে গিল্ড ব্যবস্থার সূচনা হইয়াছিল ? (ঙ) কিরূপে গিল্ড ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হইত ? (চ) "বুর্জোয়া" বলিতে কি বুঝ ? কিভাবে "বুর্জোয়া" শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছিল ?

এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(১) রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইতালির বণিকগণ কোন্ সাম্রাজ্যের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল ? (২) মধ্যযুগের বণিকদের যৌথ সংস্থা কি নামে অভিহিত হইত ? (৩) কাহাদের নিকট হইতে শহরের অধিবাসিগণ চার্টার লাভ করিয়াছিল ? (৪) মধ্যযুগের কোন্ কোন্ শহরের স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য ? (৫) শহরাশ্রয়ী মধ্যবিত্তদের কি নূতন নামকরণ হইয়াছিল ?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১। প্রথম ক্রুসেডের পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে — অঞ্চল উন্মুক্ত হয় ; ২। শহরগুলির বিকাশের সহিত — ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ; ৩। শহরের অধিকাংশ রাস্তাই ছিল — এবং —।

দশম অধ্যায়

সুদূর প্রাচ্য

সূচনা : সুদূর সাইবেরিয়ার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত হইতে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত বরাবর এক বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডকে সুদূর প্রাচ্য বা পূর্ব এশিয়া নামে অভিহিত করা হয়। চীন এবং জাপান এই দুই দেশই সুদূর প্রাচ্যের অন্তর্ভূক্ত সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দেশ।

মধ্যযুগের চৈনিক সভ্যতা

তাঙ্ বংশের আবির্ভাব : চীন দেশ সুদূর প্রাচ্যের প্রাণকেন্দ্র। চীনের হান সাম্রাজ্য (২০৬-২২০ খ্রীঃ) রোমান সাম্রাজ্যের সমসাময়িক ছিল। রোমান সাম্রাজ্যের ন্যায় বৈদেশিক আক্রমণের ফলে হান সাম্রাজ্যের অবস ন ঘটিয়াছিল। হানবংশের পতনের পর দীর্ঘ সাড়ে তিন শত বৎসর চীনে বহু খণ্ড রাজ্য ও নিরন্তর যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখা দেয়। এই সময় চীনে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু ইতিমধ্যে দেশময় বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার ফলে প্রাচীন সভ্যতা প্রায় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। অতঃপর তাঙ্ বংশের আবির্ভাব ঘটিলে চীনে এক গৌরবোজ্জ্বল যুগের সূচনা হইল।

সম্রাট হর্ষবর্ধনের সময়কালে চীনে তাঙ্ বংশ (৬১৮-৯০৬ খ্রীঃ) রাজত্ব করিত। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম কাও-ৎ-সু। তাঁহার মধ্যম পুত্র তাই-সুঙ ছিলেন তাঙ্ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তাঙ্ রাজগণের আবির্ভাবের পূর্বে সুইবংশের শাসনকাল (৫৯০-৬১৮ খ্রীঃ) চীন বহুলাংশে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের রাজত্বের শেষের দিকে দেশ পুনরায় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাই কাও-ৎ-সু-র রাজত্বকালের (৬১৮-৬২৬ খ্রীঃ) অধিকাংশ সময়ই বিভেদকামী বিরোধীদের দমন ও স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় অতিবাহিত হইয়াছিল। ৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুত্র তাই-সুঙের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করেন। তাই-সুঙ্ কঠোর হস্তে

চীনে ঐক্য স্থাপন

বিরোধীদের দমন করেন এবং বিদেশী মোঙ্গলদের পরাজিত করিয়া চীন হইতে বিতাড়িত করেন, এইভাবে সমস্ত চীনে ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল।

অভ্যন্তরীণ সংস্কার ও সাংস্কৃতিক প্রগতি ঃ দেশে ঐক্য প্রতিষ্ঠা ভিন্ন বিবিধ সংস্কার ও সাংস্কৃতিক প্রগতির জন্য তাঙ্ যুগ বিশেষত স্মরণীয়।

আইন প্রণয়ন ঃ তাঙ্ যুগে বহু খুঁটিনাটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আইন রচিত হইয়াছিল। প্রথমত, এই আইনে বিদেশ সম্পর্কে বেশ কঠোর বিধিব্যবস্থা ছিল। আইনত চীনের লোকজনদের বিদেশ যাত্রা প্রায় নিষিদ্ধ ছিল, কারণ বিদেশভ্রমণ সরকারী অনুমোদন-সাপেক্ষ ছিল। ইহা ছাড়া কোন বিদেশী পুরুষকে বিবাহ করিলে তাহাও অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত এবং অপরাধীকে নির্বাসন দণ্ড ভোগ করিতে হইত। দ্বিতীয়ত, সামরিক ও বেসামরিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারীদের উপর কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হইয়াছিল। সরকারী কর্মচারীদের পরীক্ষা-সংক্রান্ত শৃঙ্খলা মানিয়া চলিতে হইত। ইহা ছাড়া সরকারী আদব-কায়দা মাফিক চলা, সরকারী তথ্য যাহাতে ফাঁস না হইয়া যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা, উৎকোচ গ্রহণ সম্পর্কে সতর্ক হওয়া ঐ সকল কর্মচারীদের পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল। তৃতীয়ত, তাঙ্ আইনে পারিবারিক বিরোধ, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং বিবাহের বাগ্ দান প্রভৃতি পারিবারিক বিষয়ের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল। ইহা ছাড়া চুরি, ডাকাতি, কলহ-বিবাদ, অযথা বলপ্রয়োগ প্রভৃতি বিভিন্ন অপরাধ-মূলক কাজকর্মের জন্য নানা ধরনের শাস্তির বিধান ছিল। এইগুলি ভিন্ন বৈষয়িক এবং বাণিজ্যিক লেন-দেন-সংক্রান্ত বিষয়েও আইন বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল।

শিক্ষাব্যবস্থা ঃ চীনের শিক্ষাব্যবস্থার একটি নির্দিষ্ট ধরন ছিল এবং তাহা হইল এই যে, সেখানে পরীক্ষাই ছিল শিক্ষার মাপকাঠি। সেই কারণে চীনের শিক্ষার্থীরা দেশের প্রশাসনিক কর্মক্ষেত্রে লিপ্ত হইবার নিমিত্ত সেই পরীক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়েই মূলত পড়াশুনা করিত। বস্তুত পরীক্ষার মাধ্যমেই সেখানে পরীক্ষার্থীদের মধ্য হইতে যথার্থ শিক্ষিত, ধার্মিক ও যোগ্য প্রার্থীদের বাছাই করিবার রীতি ছিল। পরীক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট পাঠক্রম ছিল। সেই পাঠক্রম অনুযায়ী পরীক্ষার্থীদের মনীষী কনফিউশিয়াসের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাদির পঠন-পাঠন, ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করিতে হইত। এমন কি, কনফিউশিয়াসের

উপদেশসমূহের দৈনন্দিন জীবনে উপযোগিতা ও প্রয়োগ সম্পর্কেও অনুশীলন করিতে হইত। তাঙ্ আমলে শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে চীন বেশ উন্নত ছিল। সম্রাট তাই-সুঙ্ সরকারী বিদ্যালয় স্থাপন এবং সকলের জন্য উন্মুক্ত পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করেন। ইহা ছাড়া তাঙ্ যুগে পরীক্ষায় কৃতিত্ব বা ডিগ্রী অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের কেবলমাত্র কনফিউশিয়াসের রচনাদি পাঠ করিলেই চলিত না। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তাহাদের ইতিহাস, আইনশাস্ত্র, গণিত, কাব্য, হস্তাক্ষর বিদ্যা ও তাও দর্শন প্রভৃতি আয়ত্ত করিতে হইত।

সাহিত্য ঃ সাহিত্যে, বিশেষত কাব্য সাহিত্যের বিকাশের ক্ষেত্রে তাঙ্ যুগ স্মরণীয় হইয়া আছে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীনে প্রথম চা'য়ের প্রচলন হয় এবং উহা ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইয়া উঠে। ফলে তাঙ্ যুগে কবিগণ প্রতি কাপ চায়ের মাদকতা সম্পর্কে বহু কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। ঐ যুগের প্রায় দুই সহস্র কবির সন্ধান পাওয়া যায়, তন্মধ্যে লি-পু এবং তু-ফু ছিলেন বিখ্যাত।

মুদ্রণ শিল্প ঃ তাঙ্ যুগে চীনে প্রথম পুস্তক মুদ্রিত হয়। চীনের তুন-হুয়াং গুহায় কাঠের উপর খোদাই করা অক্ষরের সাহায্যে মুদ্রিত গ্রন্থে একটি বৌদ্ধ শ্লোক লিপিবদ্ধ আছে। ইহা ছাড়া সংস্কৃত ও চীনা অক্ষর মুদ্রণের ব্যবস্থা ছিল।

চারুকলা ঃ চিত্র, ভাস্কর্য ও কুটির-শিল্পে তাঙ্ যুগের দান উল্লেখযোগ্য। সমসাময়িক চীনামাটির উপর তাঙ্ যুগের কুটির-শিল্পের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।



চীনামাটির পাত্র

চিত্র-শিল্প

তাঙ্ যুগে চিত্র-শিল্পের চরম বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। সেই যুগের শিল্পীদের খুবই সুনাম ছিল। উ-তাও-সুয়ান ছিলেন সেই যুগের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর। ভূ-চিত্র অঙ্কনে তাঁহার আশ্চর্য দক্ষতা ছিল। ভূ-চিত্র ভিন্ন তিনি বৌদ্ধ ও তাও ধর্মের বিষয়বস্তু লইয়াও চিত্রাঙ্কন করিতেন।

তাঙ্ যুগে চীনে ওয়াং-উই নামক আর একজন প্রতিভাবান শিল্পীর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি একই রঙের বিভিন্ন আভা ফুটাইয়া ভূ-চিত্র অঙ্কনে পারদর্শী ছিলেন। তিনি ছিলেন দক্ষিণ শিল্পীগোষ্ঠীভুক্ত।

পক্ষান্তরে এই যুগে উত্তর শিল্পিগোষ্ঠীর অন্যতম নেতা ছিলেন লি-সু-সুন। তাঁহার অনুগামী শিল্পিগণ প্রধানত বৌদ্ধ ও তাও ধর্ম-সংক্রান্ত বিষয় ও ঐতিহাসিক দৃশ্যাবলী অবলম্বনে চিত্রাঙ্কন করিতেন।

তাঙ্‌ যুগে ভাস্কর্য শিল্পের অভূতপূর্ব বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, তাঙ্‌ যুগের বৌদ্ধ উপাসনা-গৃহগুলিতে নির্মিত মূর্তিতে ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্পের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে ভারতের গান্ধার অঞ্চলে বৌদ্ধমূর্তি নির্মাণ ক্ষেত্রে 'গ্রীক-বৌদ্ধ শিল্পরীতির' যে অভূতপূর্ব বিকাশ হইয়াছিল তাঙ্‌ যুগের শিল্পিগণ সম্ভবত তাহা দ্বারা প্রভাবিত হন। এছাড়া তাঙ্‌ ভাস্কর্যে 'পরবর্তী' গুপ্তযুগীয় শিল্প-নৈপুণ্যের প্রভাব বিদ্যমান।

ভাস্কর্য—ভারতের প্রভাব

ব্যবসায়-বাণিজ্য ঃ তাঙ্‌ যুগে বৈদেশিক বাণিজ্য পূর্ববর্তী যুগ অপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তবে এক্ষেত্রে চীনে বসবাসকারী বিদেশীগণই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল।

তাঙ্‌ রাজত্বকালের প্রথমদিকে চীনের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত তারিম উপত্যকা ভেদ করিয়া বিদেশীরা ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাইত। কিন্তু অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে উপত্যকা অঞ্চলে নানা গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল। এদিকে ইতিমধ্যে বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে তাঙ্‌ সাম্রাজ্যে রাজধানী চাঙগানের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতেছিল। এই কারণে বিদেশীরা ইহাকে চীনের সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলির দ্বারদেশ বলিয়া গণ্য করিত।

স্থলপথে

তাঙ্‌ রাজত্বের শেষের দিকে স্থলপথে নানা বাধাবিপত্তি দেখা দিলে জলপথের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সপ্তম শতাব্দীর শুরু হইতেই বন্দর হিসাবে ক্যাণ্টনের প্রসিদ্ধি ছিল। সেইহেতু অষ্টম শতাব্দীতে পার্শী, আরবীয় এবং ভারতীয় বণিকগণ বড় বড় বাণিজ্য জাহাজ লইয়া ক্যাণ্টনে হাজির হইতেন। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্যাণ্টনে একটি চৈনিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

জলপথে

তাঙ্‌ যুগে চীন হইতে যে সকল পণ্য বিদেশে রপ্তানি হইত তাহার মধ্যে রেশমবস্ত্র, মসলা এবং নানাধরনের চীনামাটির দ্রব্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পক্ষান্তরে গজদন্ত, তামা, কাছিমের খোলা এবং গণ্ডারের শিং প্রভৃতি চীনে আমদানি করা হইত।

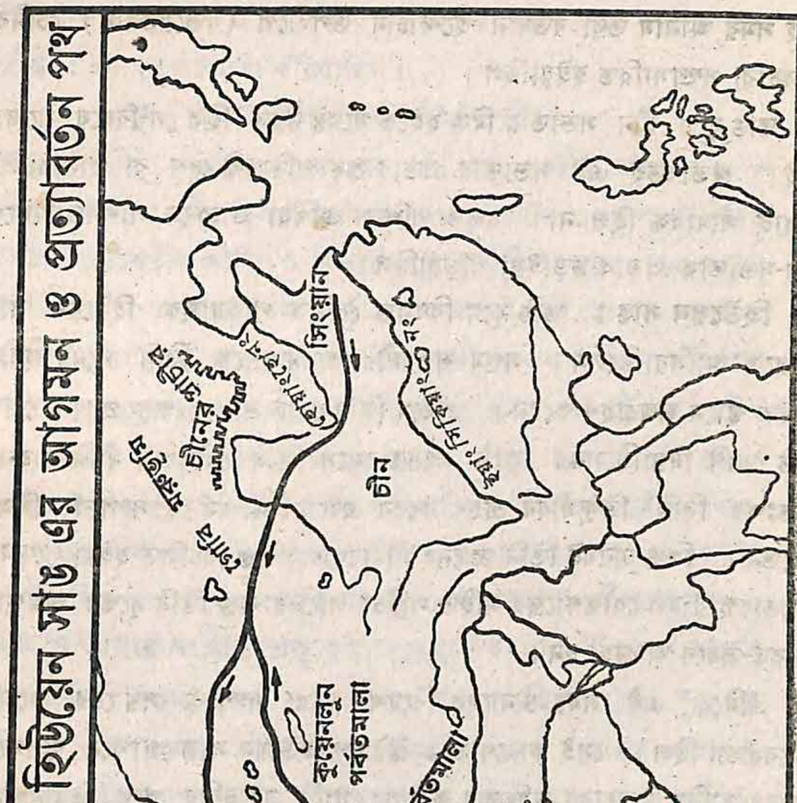
কৃষিকার্য: সপ্তম শতাব্দীতে তাঙ্ রাজগণের অভ্যন্তরীণ সংস্কারের ফলে চীনের আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী এলাকা জুড়িয়া জমি চাষ হইত। কারণ তাঙ্ রাজগণ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে জলসেচের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া অধিকাংশ জমিতে যাহাতে প্রতি বৎসর দুইবার ফসল উৎপন্ন হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হইত। অধিকন্তু চাষের কাজে উৎসাহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে চাষীদের মধ্যে ভূমি বণ্টনের নীতি গৃহীত হইয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম: তাঙ্ রাজত্বকালকে চীনের বৌদ্ধযুগ বলিয়া বর্ণনা করা হয়। তাঙ্ রাজগণের মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধ ছিলেন।

তাঙ্‌যুগে বৌদ্ধ সাহিত্য-সংক্রান্ত পুঁথিপত্র রচিত হইত। এক্ষেত্রে চৈনিকগণ শুধুমাত্র বৈদেশিক গ্রন্থাদি অনুবাদ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা অনেক মূল গ্রন্থও রচনা করেন।

ইহা ছাড়া বৌদ্ধধর্মের প্রসারের ফলে চীনে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর উদ্ভব হইয়াছিল।

প্রতিবেশী রাজ্যসমূহে চীনের প্রভাব: তাঙ্‌যুগে চীনে যে উন্নত ধরনের সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল তাহা স্বভাবতই প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে প্রভাবিত করিয়াছিল। ইতিপূর্বে সুই রাজাদের আমলেই বৌদ্ধধর্মের সহিত চীন-সভ্যতার অনেক কিছু প্রতিবেশী দেশ জাপানে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল। জাপান হইতে অনেকেই বিশেষত শিক্ষার্থীরা চীনে আসিয়াছিল, চীন হইতেও বহু সংখ্যক প্রতিনিধি জাপানে গিয়াছিল। ক্রমে জাপানীরা চীনের চারুকলা, সাহিত্য, ধর্ম, প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রভৃতি অনুকরণে উদ্যোগী হইয়া ছল। তবে জাপানীরা চীনের সবকিছুই সরাসরি নকল না করিয়া ভালমন্দ বিচার করিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। জাপান ও চীনের সন্নিহিত রাজ্য কোরিয়াও চীন-সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। সেইরূপ চীনের দক্ষিণে মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল স্থলভাগেও চীন-সভ্যতার প্রভাব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, ফলে



হিউয়েন সাঙ এর আগমন ও প্রত্যাবর্তন পথ

সেই সময় আনাম তথা বর্তমান ইন্দোচীন উপদ্বীপে (ভিয়েতনাম) চৈনিক ভাবধারা সম্প্রসারিত হইয়াছিল।

তাঙ্ যুগে চীন সভ্যতার দিক হইতে যথেষ্ট উন্নত ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্বভাবতই এই সভ্যতার প্রভাব শুধু প্রতিবেশী দেশ বা রাজ্যগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বস্তুত পশ্চিম এশিয়া ও ক্রমে পাশ্চাত্য দেশে চীন-সভ্যতার প্রভাব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

হিউয়েন সাঙ : তাঙ্ যুগে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ভারতে আসিয়াছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দশকে তিনি চীনের হুনান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুপ্রেরণায় বৌদ্ধ মঠে যোগ দিয়াছিলেন। কুড়ি বৎসর বয়সে তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। অতঃপর তিনি ভিক্ষুজীবন গ্রহণ করেন এবং বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন। কিন্তু ক্রমেই তিনি জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার জন্য বিচলিত হইয়া পড়েন। এমতাবস্থায় মূল বৌদ্ধশাস্ত্রের সহিত পরিচয় লাভের জন্য তিনি বুদ্ধের জন্মস্থান ভারত-ভ্রমণে আগ্রহী হন।

এদিকে এই সময় চীনাদের বিদেশ যাত্রা সম্পর্কে সম্রাটের কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল। সেই কারণে ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে হিউয়েন সাঙ গোপনে স্থলপথে চীনের তারিম উপত্যকা অতিক্রম করিয়া গোবি মরুভূমির পথে তিয়ানশান, তাসখন্দ, সমরখন্দ, বহ্লিক ও পুরুষপুর প্রভৃতি স্থানের মধ্য দিয়া ভারতের কাশ্মীর রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হন (৬৩১ খ্রীঃ)। দুই বৎসর কাশ্মীরে অতিবাহিত করিয়া হিউয়েন সাঙ ভারতের বৌদ্ধ তীর্থস্থানসমূহ পরিদর্শন করেন, ভারতীয় পণ্ডিতগণের সান্নিধ্যে বৌদ্ধশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। সেই সময়ে বৌদ্ধ জগতে ভারতের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অশেষ খ্যাতি ছিল। হিউয়েন সাঙ দীর্ঘদিন নালন্দায় অধ্যয়ন করেন, ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রভূত সম্মানসহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ভারত হইতে তিনি বহু গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি চীনে লইয়া গিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ভারতের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীতে যাহা বর্ণিত আছে তাহা ভারত-ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ।

ফলাফল : হিউয়েন সাঙের ভারত-ভ্রমণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইহার

ফলে চীন দেশে বৌদ্ধধর্ম জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল এবং সেই কারণে ইহা চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রসারে সহায়তা করিয়াছিল।

সুঙ্ রাজত্বকাল (৯৬০-১২৭৯ খ্রীঃ)

সূচনা : তাঙ্ সাম্রাজ্যের পতনের পর চীনে পুনরায় অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। অতঃপর ৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে সুঙ্ বংশ প্রতিষ্ঠিত হইলে চীনে অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। সুঙ্ বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম চা-ও-কুয়াঙ্ জিন। তাঁহার রাজধানী ছিল হোনান প্রদেশের অন্তর্গত পিয়েনলিয়াঙে। এই রাজবংশ উত্তর সুঙ্ রাজবংশ নামে অভিহিত ১১২৭ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর সুঙ্ গণের পতন ঘটিলে দক্ষিণে সুঙ্ বংশের উত্থান ঘটে। তাহাদের রাজধানী ছিল লিন-আন নামক স্থানে। যাহা হউক ৯৬০ হইতে ১২৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুঙ্ বংশ চীনে রাজত্ব করিয়াছিল। তাহাদের সুদীর্ঘ রাজত্ব-কালে চীনে উল্লেখযোগ্য সমৃদ্ধি দেখা দিয়াছিল। চৈনিক চিন্তাধারা ও চারুকলার বিকাশ হইয়াছিল এবং চীনের সংস্কৃতি অন্যান্য দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

ওয়াং ও তাঁহার সংস্কার প্রস্তাব : সুঙ্ যুগে ইয়াংসি উপত্যকা অঞ্চলে বুদ্ধিবাদ অর্থাৎ বিশুদ্ধ যুক্তিই জ্ঞানার্জনের উপায়, এই মতবাদের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে সমসাময়িক চীনের অন্যতম সংস্কারক ওয়াং-এর (১০২১-১০৮৬ খ্রীঃ) নাম স্মরণীয় হইয়া আছে। ওয়াং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য, কৃষিব্যবস্থা, রাজস্বনীতি, শিক্ষা ও সামরিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন চীনের প্রশাসনিক শ্রেণীভুক্ত। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সরকারী চাকুরী লাভের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছিলেন।

বাণিজ্য-সংক্রান্ত সংস্কার

ওয়াং বাণিজ্য ক্ষেত্রে সরকারের একচেটিয়া অধিকার স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন যে, প্রতিটি জেলার উৎপন্ন দ্রব্য প্রথমে রাজকর পরিশোধ করিবার জন্য ব্যয় করা হইবে এবং তারপর যাহা থাকিবে তাহা জেলার চাহিদা মিটাইবে। অতঃপর যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে সরকার তাহা ক্রয় করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখিবে। ভবিষ্যতে ঐ অঞ্চলে অভাব দেখা দিলে মজুত ভাণ্ডার হইতে সেই অভাবের পরিপূরণ হইবে অথবা সরকার ঐ উদ্বৃত্ত অন্যত্র সরাইয়া লইয়া গিয়া

বিক্রয় করিবে। ইহা ছাড়া সঞ্চিত ভাণ্ডারের সাহায্যে বিদেশের সহিত পণ্য বিনিময় প্রথা চালু রাখা এবং পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্য অগ্রিম দেওয়া সম্ভব হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, ওয়াং আবাদকালে চাষীদের দুই শতাংশ হারে কৃষিঋণ দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ঋণ আদায়ের নিরাপত্তা হিসাবে জমির শস্যই যথেষ্ট।

কৃষিঋণ-সংক্রান্ত ব্যবস্থা

এই সময় চীনে একদল কুসীদজীবী চাষীদের চড়া হারে সুদ আদায়ের ভিত্তিতে ঋণ দিত। ফলে চাষীরা ক্রমশঃ ঐ সুদখোরদের বেড়াজালে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছিল। সেই কারণে ওয়াং তাঁহার সংস্কার দ্বারা শস্য রোপণ ও বপনকালে চাষীদের সরকারী ঋণদানের ব্যবস্থা চালু করিতে চাহিয়াছিল।

কৃষির উন্নতির সহিত সংশ্লিষ্ট ওয়াং-প্রবর্তিত আর একটি সংস্কার প্রস্তাব ছিল সরকার কর্তৃক বাধ্যতামূলক শ্রম আদায়-প্রথার অবসান। প্রধানতঃ গরীব

বাধ্যতামূলক শ্রম আদায়-প্রথার অবসান-সংক্রান্ত প্রস্তাব

চাষীরা এই প্রথায় ক্ষতিগ্রস্ত হইত, কারণ চাষের সময় প্রায়ই তাহাদের অন্য কাজ করিতে বাধ্য করা হইত। ওয়াং এই প্রথার অবসান ঘটাইয়া তাহার পরিবর্তে সম্পত্তির উপর কর ধার্যের রীতি প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। সম্পদের ভিত্তিতে জমির মালিকগণকে পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করিয়া যাহার যেমন সম্পদ আছে তাহাতে সেইমত কর দিতে হইবে, ইহাই ছিল ওয়াং-এর প্রস্তাব।

ওয়াং দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার

প্রস্তাবসমূহের পরিণতি

প্রস্তাবগুলি কিছুদিনের জন্য কার্যকর করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, কিন্তু কালক্রমে পরিমার্জিত আকারে কিছুটা বজায় রাখিয়া ওয়াং-এর অধিকাংশ প্রস্তাবই পরিত্যক্ত হয়।

শিক্ষাব্যবস্থা : সুঙ্ রাজত্বকালে দেশে শিক্ষার মান যথেষ্ট উন্নত ছিল। দেশে জ্ঞানী-গুণী লোকের অভাব ছিল না। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই কনফিউ-শিয়াসের চিন্তাধারা পাঠ্য ছিল। ওয়াং তাঁহার সংস্কার প্রস্তাবেও দেশের

শিক্ষা-পদ্ধতি

শিক্ষাব্যবস্থা বিশেষত পরীক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তনের উপর গুরুত্ব দিয়াছিলেন। সরকারী পরীক্ষায় তিনি পরীক্ষার্থীদের সাহিত্য রচনার যোগ্যতা নির্ধারণের পরিপন্থী ছিলেন। পক্ষান্তরে তাঁহার মতে

পরীক্ষার্থীরা যাহাতে সুপ্রাচীন শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহের নীতি ও আদর্শ সাম্প্রতিক সমস্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়াই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, তাঙ্ যুগে কোন পরীক্ষা ছাড়াই প্রশাসনিক ব্যবস্থার অধস্তন পদগুলি পূরণ করা হইত। এক্ষণে ঐ নীতি পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

সাংস্কৃতিক অগ্রগতি: সুঙ্ যুগে চীনের সাংস্কৃতিক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। দেশে অনেক বড় বড় পণ্ডিত ও দার্শনিক ঈশ্বরতত্ত্ব ও দর্শন-সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করিতেন। কনফিউশিয়াসের চিন্তাধারার মূল্যায়ন হইয়াছিল।

কাব্য, প্রবন্ধ ও ইতিহাস

বহু কাব্য, প্রবন্ধ ও ইতিহাস রচিত হইয়াছিল। বস্তুত ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সুঙ্ রাজত্বকাল খুবই স্মরণীয়। অবশ্য ইতিপূর্বে তাঙ্ যুগে অনেক বড় বড় ঐতিহাসিক ছিলেন। তবে সুঙ্ ঐতিহাসিকগণ মূলত তাঁহাদের নিজস্ব রীতি অনুযায়ীই ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। অতীত সম্পর্কে তীব্র অনুসন্ধিৎসা হেতুই তাঁহারা ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এমন কি, সুঙ্ যুগের কবিগণও অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন।

মুদ্রণ শিল্প: সুঙ্ যুগে মুদ্রণ শিল্পের উন্নতি হইয়াছিল। সরকারী প্রচেষ্টায় বড় বড় ইতিহাস গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিও অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করিত। এই কারণে মুদ্রণ ব্যবস্থার সহিত যুক্ত কাঠের উপর খোদাই-এর কার্যে লিপ্ত লিপিকারগণের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ফলে কোন পাণ্ডুলিপি যখন পুস্তকাকারে বাহির হইত তখন লেখক ও প্রকাশকের সহিত লিপিকার বা মুদ্রকের নাম মুদ্রিত হইত।

চিত্রকলা—চীনামাটির পাত্র: সুঙ্ যুগে স্থাপত্য-শিল্পের তেমন উন্নতি হয় নাই বরং অবনতি ঘটিয়াছিল। কিন্তু চিত্র-শিল্পে এবং বিশেষত ভূ-চিত্র অঙ্কনে এযুগের শিল্পীদের কৃতিত্ব সুবিদিত। ইহা ছাড়া পশুপক্ষী এবং বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবলী প্রভৃতি লইয়াও নানা চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল। অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রেও শিল্পীদের প্রাচীন যুগের প্রতি আকর্ষণ উল্লেখযোগ্য।

সুঙ্ যুগে চীনামাটির পাত্রের বহুল ব্যবহার প্রচলিত ছিল। পাত্রগুলিকে সুন্দর সুন্দর চিত্রাঙ্কনের সাহায্যে আকর্ষণীয় করা হইত।

মোঙ্গল বা য়ুয়ান যুগ

মোঙ্গল জাতির পরিচয় ঃ ভাষা ও জাতিগতভাবে মোঙ্গলরা তুর্কীদের সমগোত্রীয়। দ্বাদশ শতাব্দীর সূচনাকালে তাহারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া বৈকাল হ্রদের দক্ষিণ ও পূর্বভাগে বসবাস করিতেছিল। তাহারা ছিল স্বভাবতই যাযাবর। বিস্তীর্ণ প্রান্তর বা চলন্ত শিবির ছিল মোঙ্গলদের বাসস্থান। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তেমোচীনের নেতৃত্বে মোঙ্গল জাতি ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল। ক্রমে তাহারা দুর্ধর্ষ বাহিনীতে পরিণত হইয়াছিল। তেমোচীন ছিলেন মধ্য এশিয়ার কারাকোরামের 'খান'। তবে তিনি তাঁহার চৈনিক উপাধি 'চেঙ্গিস' নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ।

কুবলাই খান ঃ চেঙ্গিসের পৌত্র কুবলাই খানের আমলেই দক্ষিণ চীনে মোঙ্গলদের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। কুবলাই প্রথমে তাঁহার ভ্রাতা মঙ্গুর রাজত্বকালে চীনের উত্তরাংশের শাসনকর্তা ছিলেন। ১২৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মঙ্গুর মৃত্যু হয় এবং শীঘ্রই কুবলাই 'খান' পদে অভিষিক্ত হন। তখনও চীনের দক্ষিণ অংশে সুঙ্ বংশ রাজত্ব করিত। ১২৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কুবলাই খান সুঙ্ বংশের পতন ঘটাইয়া সুঙ্ রাজধানী দখল করেন। ফলে প্রায় সমগ্র চীন দেশে কুবলাই খানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

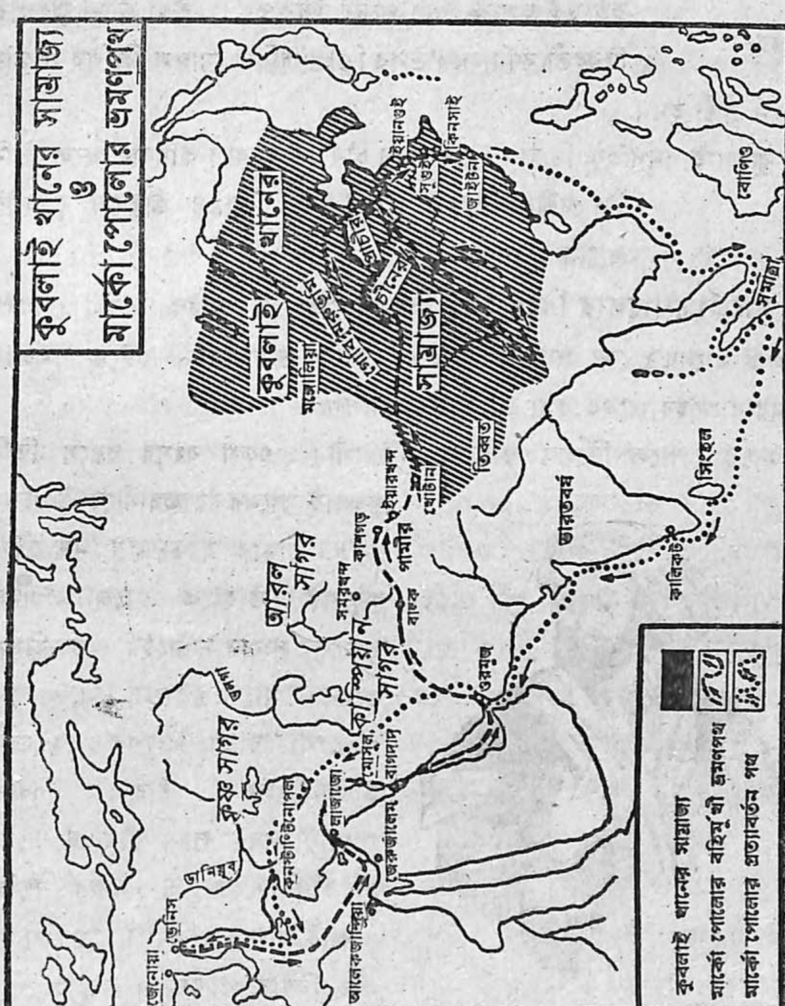


কুবলাই খান

রাজধানী

কুবলাই খান বর্তমান পিকিং (অধুনা বেজিং) শহরের নিকট তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। ইওরোপ এবং এশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চলের অধীশ্বর হইলেও কার্যত তিনি চীনের উপর-ই প্রভুত্ব করিতেন।

কুবলাই তিব্বতের লামার নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। তিনিই তিব্বতের


কুবলাই খানের সাম্রাজ্য
ও
মার্কো পোলোর ভ্রমণপথ
কুবলাই খানের সাম্রাজ্য
মঙ্গোলিয়া
তিব্বত
খোটান
ইয়ারখন্দ
কাশগড়
সমরখন্দ
পামীর
বল্খ
আরল সাগর
কাস্পিয়ান সাগর
কৃষ্ণ সাগর
কনস্টান্টিনোপল
জেরুজালেম
বাগদাদ
হরমুজ
ভারতবর্ষ
কালিকট
সিংহল
সুমাত্রা
বোর্নিও
জেনোয়া
ভেনিস
আলেকজান্দ্রিয়া
কুবলাই খানের সাম্রাজ্য
মার্কো পোলোর বহির্মুখী ভ্রমণপথ
মার্কো পোলোর প্রত্যাবর্তন পথ

লামাকে সেখানকার প্রধানরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কালক্রমে ইহা হইতেই দলাই লামা পদের উদ্ভব হয়। ইহা ছাড়া কুবলাই

ধর্মান্তর

তিব্বতী বর্ণমালার উপর ভিত্তি করিয়া মোঙ্গল লিপির সংস্কার সাধনে ব্রতী হন।

কুবলাই ধর্মসহিষ্ণু ছিলেন। দীর্ঘদিন চীন দেশে বাস করিবার ফলে তিনি চীন দেশীয় সভ্যতায় আকৃষ্ট হন। ১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কুবলাই

মৃত্যু

খানের মৃত্যু হয়।

মার্কো পোলোর বিবরণী ঃ বিখ্যাত ইতালীয় পর্যটক মার্কো পোলো কুবলাই খানের রাজ্যে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণকাহিনী হইতে কুবলাই খানের রাজত্বের অনেক কথা জানিতে পারা যায়।

মার্কো পোলো ছিলেন ভেনিসের অধিবাসী। একুশ বৎসর বয়সে তিনি কুবলাই খানের রাজধানীতে উপস্থিত হন। তাঁহার বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ হইয়া কুবলাই তাঁহাকে রাজ্যের সমস্ত অঞ্চলের সংবাদ সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত করেন। মার্কো পোলো চীন, জাপান ও চম্পা রাজ্য ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণী অনুযায়ী সেই সময় চীন দেশে বহু জনাকীর্ণ শহর ও বন্দর ছিল। কুবলাই খানের সুবিশাল সাম্রাজ্যে বহু বৌদ্ধ বিহার, পান্থশালা ও দ্রাক্ষাক্ষেত ছিল। কৃষির উন্নতির জন্য খাল খনন করা হইয়াছিল এবং ভারত ও পারস্যের সহিত চীনের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। ইহা ছাড়া তাঁহার ভ্রমণকাহিনীতে ব্রহ্মদেশ, জাপান ও ভারত সম্পর্কে বহু অবিশ্বাস্য ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে।



মার্কো পোলো

মার্কো পোলোর ভ্রমণ-বৃত্তান্তের গুরুত্ব ঃ মার্কো পোলোর 'ভ্রমণ-বৃত্তান্তে' প্রাচ্য দেশের সম্পদ-সংক্রান্ত নানা কাহিনী সমসাময়িক ইওরোপে

দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। ফলে ইওরোপীয় দেশগুলি প্রাচ্য দেশের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহিত হইয়াছিল। এছাড়া মোঙ্গল দরবারে মার্কো পোলোর সমাদর ইওরোপে মোঙ্গলদের সম্পর্কে ভয়ভীতি দূর করিয়াছিল।

জাপান

সূচনা : প্রাচীনকাল হইতেই জাপানের সমাজ ছিল গোষ্ঠীকেন্দ্রিক, অন্যান্য দেশের ন্যায় পরিবারকেন্দ্রিক নহে। কতকগুলি পরিবার লইয়া একটি গোষ্ঠীর সৃষ্টি হইত, গোষ্ঠীভুক্ত সকলেই কোন এক আদিপুরুষ হইতে উদ্ভূত বলিয়া আত্মপরিচয় দিত। ইহা ছাড়া জাপানের সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রেও বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। মধ্যযুগের শুরুতে জাপানী সমাজে কঠোর ও ক্রমোচ্চ সামাজিক শ্রেণীভেদ-প্রথা চালু ছিল। সেইমত সামাজিক স্তরের সর্বোচ্চ ধাপে ছিলেন সম্রাট ও তাঁহার পরিবারবর্গ। ইহার ঠিক নীচেই ছিল অভিজাত শ্রেণী যাহা মূলতঃ গোষ্ঠীপ্রধানদের লইয়া গঠিত হইত। অভিজাত শ্রেণীর নীচে ছিল জমিদার ও সৈন্যদল এবং সর্বনিম্ন স্তরে ছিল সাধারণ লোকজন। কৃষক-মজুর হইতে শুরু করিয়া ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী এবং বিভিন্ন পেশায় লিপ্ত সকলেই সাধারণ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সমাজ

ক্রমোচ্চতার ভিত্তিতে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস

মধ্যযুগে জাপানের আর্থিক জীবন ছিল কৃষিভিত্তিক। দেশের সমস্ত জমি-জমাই ছিল অভিজাত শ্রেণী তথা গোষ্ঠীপ্রধানদের হাতে। বিদেশীরা জাপানের সম্রাটের নাম দিয়াছিলেন 'মিকাডো'। তাঁহার ক্ষমতা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। কিন্তু ক্রমে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যেও বিবাদ শুরু হইয়াছিল। কারণ জমির মালিকানাই ছিল ক্ষমতার উৎস, অথচ জাপানের বিভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর ভিতর জমিজমা সমানভাবে বন্টিত হয় নাই। এমন কি, কোন কোন গোষ্ঠীর হাতে খুবই স্বল্প পরিমাণ জমি ছিল, এমতাবস্থায় জাপানে আমূল সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল।

কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি

সেইমত ৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে 'তইকা-বিধি' বা মহান্-সংস্কার প্রবর্তিত হয়। এই সংস্কারের ফলে রাষ্ট্রই হইল দেশের সমস্ত জমিজমার মালিক। ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর অবসান ঘোষিত হইল এবং এই সঙ্গে দেশের সকল শ্রেণীর মানুষ কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন হইল। কিন্তু গোষ্ঠীপ্রধানদের সন্তুষ্ট রাখিবার প্রয়োজন ছিল। তাই তাহাদের সমস্ত অধিকার ও ক্ষমতার অবসান না ঘটাইয়া তখন হইতে স্ব স্ব এলাকায় প্রধান রাজকর্মচারিরূপে নিয়োগ করা হইল। ইহা ছাড়া তাহাদের জমিদারী হইতে আদায়ীকৃত অর্থের কিছু পরিমাণ তাহাদের বেতনস্বরূপ দেওয়া হইত এবং বাকী উদ্বৃত্ত অংশ রাজকর হিসাবে গণ্য হইত। এদিকে সংস্কারের ধারা অনুযায়ী সমস্ত জমিজমা সরকারের খাস দখলে চলিয়া আসিয়াছিল এবং সেগুলি পুনর্বণ্টনের ক্ষেত্রে সম্রাটের অবাধ অধিকার ছিল। তাই এক্ষণে দেশের সমস্ত জমিজমা সুনির্দিষ্ট নিয়মের ভিত্তিতে অগণিত ক্ষুদ্র চাষীদের মধ্যে বণ্টন করা হইল। কিন্তু ইহা চিরস্থায়ী ছিল না, প্রতি ছয় বৎসর অন্তর জমির মালিকানা সরকারের হাতে ঘুরিয়া আসিত। সরকার তখন পরিস্থিতি অনুযায়ী সেগুলি যোগ্য চাষীদের ভিতর পুনর্বণ্টন করিতেন। বস্তুত এই ব্যবস্থা জাপানের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটাইয়াছিল।

মহান্ সংস্কার—কৃষিজমির পুনর্বণ্টন

বণ্টন ব্যবস্থা—অস্থায়ী বণ্টন

এদিকে এই ব্যবস্থা ভালভাবে চালু রাখিতে হইলে এই সকল কার্যে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারীদের বিশেষত, প্রদেশ ও জেলার প্রধান প্রধান শাসকদের সহযোগিতা লাভের প্রয়োজন ছিল। তাই তাঁহাদের সন্তুষ্ট করিতে ভোগদখলের জন্য তাঁহাদেরও অনেক জমি ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। এক্ষণে এইভাবে কৃষি-জমি পুনর্বণ্টিত হওয়ায় পূর্বের বহু বড় বড় গোষ্ঠীর ক্ষমতা লোপ পাইয়াছিল। পক্ষান্তরে রাজশক্তির সহিত সরাসরি সম্পর্কযুক্ত অন্য দলগুলির প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাওয়ায়, ইহাদের ভিতর সকলেই রাজা বা সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিতে লাগিল। বস্তুত মহান্ সংস্কারের মূল লক্ষ্য ছিল সবকিছুর কেন্দ্রিকরণ। ফলে জাপানের সম্রাট বা মিকাডোর ক্ষমতা সর্বাত্মক হইয়া উঠিল। অতঃপর

প্রদেশ ও জেলার প্রধানদের মধ্যে ভূমিবণ্টন

মিকাডোর ক্ষমতা বৃদ্ধি

৭১০ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের রাজধানী নারা শহরে স্থানান্তরিত হইলে সম্রাটই হইলেন দেশের সর্বেসর্বা।

অষ্টম শতাব্দীর শুরু হইতে চীনের সহিত জাপানের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাঙ্ রাজত্বকালে জাপানের বহু প্রতিনিধি চীনে প্রেরিত হইয়াছিল এবং জাপানের বহু শিক্ষার্থীও চীনের উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শে আসিবার উদ্দেশ্যে চীনে গিয়াছিল। ক্রমে চীনের রাজধানীর অনুকরণে জাপানের রাজধানী সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। চৈনিক স্থাপত্য ও চৈনিক সাজ-পোশাক জাপানের সর্বত্র চালু হইয়াছিল, চীনের আইন-কানুন অনুযায়ী জাপানের আইন-কানুন রচিত হইয়াছিল, এমন কি, চৈনিক বর্ণমালা অনুসরণের ফলে জাপানের লিপি, ভাষা ও সাহিত্যের সুনাম বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

চীনের সহিত সম্পর্ক

গোষ্ঠীপ্রধানদের ভিতর অসন্তোষ : নানা সংস্কারের ফলে সম্রাট তথা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর বংশানুক্রমিক প্রধানগণ সন্তুষ্ট হন নাই। ফলে শীঘ্রই এই সকল প্রধানদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই বাধিয়া গেল। এই প্রধানদের মধ্যে কাহারও কিন্তু দেশের সম্রাট হইবার ইচ্ছা ছিল না। এই পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মাধ্যমে তাঁহারা তাঁহাদের ভিতর কে সম্রাটকে নিয়ন্ত্রণ করিবেন তাহা স্থির করিতে চাহিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে জাপানের সুবিখ্যাত ফুজিওয়ারা বংশের উত্থান বিশেষত উল্লেখ্য।

সম্রাটের মর্যাদা বৃদ্ধি—ফুজিওয়ারা বংশের উত্থান : জাপানে যখন 'মহান্-সংস্কার' চালু হয় তখন কামাতারি নামে এক ব্যক্তি ফুজিওয়ারা বংশের পত্তন করেন। সংস্কারযুগের পরবর্তী পর্যায়ে জাপানে দ্বৈত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল। ফলে সম্রাট হইলেন অত্যধিক সম্মানিত ব্যক্তি এবং দেশের প্রকৃত শাসনভার ফুজিওয়ারা বংশের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল ; কারণ ইতিমধ্যে চৈনিক প্রভাবহেতু জাপানে সিণ্টো ধর্মের ধ্যানধারণা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সিণ্টো ধর্মতত্ত্ব অনুযায়ী সম্রাটের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও তাঁহার আজ্ঞানুবর্তী হওয়া ছিল বাধ্যতামূলক। তাই সম্রাটকে একাধারে প্রধান পুরোহিত ও চরম ক্ষমতার আধার বলিয়া গণ্য করা হইত। সেইহেতু সম্রাটকে জটিল প্রশাসনিক সমস্যায় বিব্রত করা চলিবে না, এবং

সাধারণ লোকেদের সহিত মেলামেশা ঘটাইলে তাঁহার সম্মানহানি হইবে। এমতাবস্থায় দেশের সমস্ত বড় বড় সামরিক ও বে-সামরিক পদসমূহে ফুজিওয়ারা পরিবারের বংশানুক্রমিক একচেটিয়া অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ক্রমে এই বংশ খুবই বিত্তশালী হইয়া উঠিয়াছিল এবং উহারাই ছিল প্রকৃত ক্ষমতার উৎস। কিন্তু ফুজিওয়ারা প্রধানগণ সরাসরিভাবে সমস্ত কাজকর্মে লিপ্ত না হইয়া তাঁহাদের বশংবদ ও অধীন কর্মচারীদের মাধ্যমেই প্রশাসনযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করিতেন। ক্রমে ফুজিওয়ারা প্রধানগণই বংশানুক্রমিকভাবে দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হইয়া উঠিয়াছিলেন। লোকে সম্রাটের অস্তিত্ব বুঝিতেই পারিত না। কারণ সম্রাট তাঁহার পারিষদবৃন্দ লইয়া রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে বিলাসবহুল জীবন যাপন করিতেন।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসাদের বিরোধিতা ঃ এদিকে অষ্টম শতাব্দীর শুরু হইতেই সরকারের নীতি ও লক্ষ্য প্রচারের উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনেকগুলি মঠ নির্মিত হইয়াছিল। অতঃপর এই সমস্ত মঠের প্রধান কেন্দ্ররূপে জাপানের রাজধানীতে একটি সুবিশাল মঠ নির্মিত হয় এবং সম্রাট সেই মঠে মহান্ বুদ্ধের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে বৌদ্ধধর্মই জাপানের জাতীয় ধর্মের মর্যাদা লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জাপানের বৌদ্ধ উপাসনাগৃহ ও মঠগুলির মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মঠগুলির নামে বহু জমি-জমাও ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। ফলে জমি হইতে আয়ের পথ সুনিশ্চিত হওয়ায় বৌদ্ধ দর্শনের পঠন-পাঠন মঠের সন্ন্যাসীদের প্রধান কাজ হইল। প্রথমদিকে মঠগুলি শুধুমাত্র শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবেই সুনাম অর্জন করিয়াছিল, কিন্তু কিছুকাল পর মঠের সন্ন্যাসীদের ভিতর একদল দেশের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিতে শুরু করিলেন। তাঁহারা বৌদ্ধ দার্শনিক তত্ত্বসমূহকে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সঙ্গে তাঁহারা জাপানের সম্রাট যে সর্বশক্তিমান নহে তাহা প্রতিপন্ন করিতে তৎপর হইয়া উঠিয়াছিলেন। ক্রমে বৌদ্ধ মঠ বা সংঘগুলি সম্রাটের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু করিলে রাজধানী হিসাবে নারা নগরী পরিত্যক্ত হইল।

"দাইমিও" ও "সামুরাই" শ্রেণীর উত্থান ঃ ৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে হেইন কিও বা বর্তমান কিয়োটো শহরে জাপানের নূতন রাজধানী স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে

ব্যাপক প্রজাবিদ্রোহ ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের আন্দোলন দমন করিতে গিয়া ফুজিওয়ারা বংশ অনেক হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা ছাড়া ফুজিওয়ারা বংশের কেহই গ্রামাঞ্চলে গিয়া জমি-জমার দেখাশুনা করিত না। ফলে দূরবর্তী প্রদেশগুলিতে যাহারা প্রকৃতই জমি-জমা দেখাশুনা করিত সেই সকল সামন্তগণ ইতিমধ্যে কতকগুলি জমিদারী গড়িয়া তুলিয়াছিল। ইঁহাদের ভিতর যাঁহাদের বড় বড় জমিদারী ছিল তাঁহারা মহাসামন্ত বা দাইমিও নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহাদের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের অধীন একদল সামরিক বাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এতকাল জাপানের সবকিছুই বে-সামরিক ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হইতেছিল। কিন্তু এক্ষণে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ফলে জাপানের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এক নূতন শ্রেণীর উদ্ভব হইল—যাহারা 'সামুরাই' শ্রেণী নামে অভিহিত হইত।

'সামুরাই' শ্রেণীর উত্থানের পর তাহাদের মধ্যে দুইটি পরিবার খুবই শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। এই দুই পরিবার যথাক্রমে টাইরা ও মিনামোটো নামে অভিহিত হইত।

রাজপ্রতিনিধি বা সোগুন পদের উত্থান ঃ জাপানের রাজনৈতিক ইতিহাসে পরবর্তী পর্যায়ে টাইরা ও মিনামোটো পরিবারদ্বয়ের অন্তর্কলহ ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। এই কলহ শেষ পর্যন্ত গৃহযুদ্ধে পরিণত হইয়াছিল। অবশেষে যুদ্ধে মিনামোটো পরিবার জয়ী হইলে এই দলের নেতা কামাকুড়া নামক স্থানে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি প্রধান সেনানায়ক বা সোগুন উপাধি লইয়া স্বাধীনভাবে শাসন শুরু করিলে তদানীন্তন সম্রাট তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ফলে তখন হইতে সোগুনই হইলেন জাপানের প্রকৃত শাসক। এইভাবে জাপানে সোগুনের উত্থান হইয়াছিল।

"সামুরাই" শ্রেণী ঃ ভারতীয় ক্ষত্রিয়দের ন্যায় জাপানের সামুরাই শ্রেণী সাহসী ও বীর যোদ্ধা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। এই শ্রেণীর উত্থানের সহিত বুশিডো প্রথা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

"বুশিডো" বা জাপানী সিভালরী ঃ ইওরোপের সামন্ততন্ত্রে নাইটদের মধ্যে যেমন 'সিভালরী' প্রথা ছিল জাপানেও সেইরূপ সামুরাই শ্রেণীর মধ্যে কতিপয় নিয়মনীতি প্রবর্তিত হইয়াছিল। জাপানীরা এই সকল নিয়মাবলীকে 'বুশিডো' নাম দিয়াছিল। এই রীতি অনুযায়ী সামুরাই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকের পক্ষেই যে-সকল কর্তব্য বাধ্যতামূলক বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিল সেগুলি এইরূপ ঃ যে যে-অবস্থায় জন্মিয়াছে সেই অবস্থাতে সন্তুষ্ট থাকা, নিজস্ব গণ্ডির বাহিরে কোন কিছু না-করা, পরিবারের প্রধানকে মান্য করা, বংশানুক্রমিক ধারার প্রতি সম্মান দেখান, পূর্বপুরুষদের সম্মান ক্ষুণ্ণ না-করা এবং দেহ ও মনকে সংযম ও নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে রাখিয়া সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ।



সামুরাই যোদ্ধা

প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক ঃ

১। তাঙ্ রাজত্বকালে চীনের আইন ও শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

২। তাঙ্ যুগে চারুকলার উন্নতি সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখ।

৩। তাঙ্ রাজত্বকালে কিভাবে চীনে ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল? ইহার ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল?

৪। তাঙ্ রাজত্বকালে চীন সভ্যতার প্রভাব কিভাবে প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল?

৫। হিউয়েন সাঙের ভারত-ভ্রমণ এবং ঐ ভ্রমণের গুরুত্ব আলোচনা কর।

৬। সুঙ্ রাজত্বকালে ওয়াং-এর প্রস্তাবসমূহ সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৭। কুবলাই খানের রাজত্বকাল বর্ণনা কর।

৮। মধ্যযুগে জাপানী সমাজে শ্রেণীভেদ ব্যবস্থার উল্লেখ কর। তইকা-বিধি প্রবর্তনের গুরুত্ব কি ছিল ?

৯। ফুজিওয়ারা বংশের উত্থানের ফলে জাপানের সম্রাটের ক্ষমতা কিভাবে সীমাবদ্ধ হইয়াছিল ? ফুজিওয়ারা বংশের পতনের কারণ নির্দেশ কর।

১০। কিভাবে জাপানের শাসনব্যবস্থায় সোগুনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক ঃ

(ক) তাঙ্ বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কে ছিলেন ? তিনি কিভাবে চীনকে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছিলেন ? (খ) তাঙ্ আইনে বিদেশীদের সম্পর্কে কি ধরনের নিষেধাজ্ঞা ছিল ? (গ) তাঙ্ যুগে শিক্ষার মাপকাঠি কি ছিল এবং শিক্ষার্থীদের কোন্ মনীষীর গ্রন্থাদি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকিতে হইত ? (ঘ) তাঙ্ যুগে বৈদেশিক বাণিজ্য কিভাবে পরিচালিত হইল ? (ঙ) তাঙ্ রাজগণ প্রধানত কোন্ ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন ? (চ) ওয়াং কে ছিলেন ? তিনি কিজন্য বিখ্যাত ? (ছ) তাঙ্ যুগে সাহিত্য ও মুদ্রণ শিল্প কতদূর উন্নত ছিল ? (জ) মোঙ্গল জাতির আদি বাসস্থান কোথায় ছিল ? (ঝ) কুবলাই খান কোন্ ধর্মে ধর্মান্তরিত হন ? কিভাবে দলাই লামা'র উৎপত্তি হইয়াছিল ? (ঞ) মার্কো পোলো কে ছিলেন ? মার্কো পোলোর ভ্রমণ-কাহিনীর তাৎপর্য কি ? (ট) বিদেশীরা জাপানের সম্রাটের কি নামকরণ করিয়াছিলেন ? (ঠ) "তইকা-বিধি" বলিতে কি বুঝ ? (ড) কিভাবে জাপানে ফুজিওয়ারা বংশের প্রাধান্য বর্ধিত হয় ? (ঢ) কিভাবে জাপানে বৌদ্ধধর্মের প্রসার হইয়াছিল ? (ণ) কাহাদের "সামুরাই" বলা হইত ? "বুশিডো" কথাটির অর্থ ও তাৎপর্য কি ?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১। সম্রাট হর্ষবর্ধনের সময়কালে চীনে — রাজত্ব করিত ; ২। তাঙ্ আইনে বিদেশ সম্পর্কে — বিধিব্যবস্থা ছিল ; ৩। তাঙ্ যুগে চীনে প্রথম পুস্তক — হয় ; ৪। সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে চীনে বন্দর হিসাবে — গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছিল ; ৫। তাঙ্ রাজত্বকালকে চীনের — যুগ বলিয়া বর্ণনা করা হয় ; ৬। উত্তর সুঙ্ বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম — ; ৭। কুবলাই খানের রাজত্বকালে ভেনিসীয় পর্যটক — চীন দেশে আসিয়াছিলেন।

——

একাদশ অধ্যায়

মধ্যযুগে ভারত

(ক) হূন অক্রমণ

হূনজাতির আবির্ভাব ঃ মধ্য এশিয়ার হূনজাতি যেমন ইওরোপের দিকে ধাবিত হইয়াছিল, সেইরূপ হূনজাতির মধ্যে একদল ভারতের দিকেও ধাবিত হয়। ভারতে আসিবার পূর্বে তাহারা পারস্য হইতে খোটান পর্যন্ত ভূভাগ দখল করে। ঐ সময় আফগানিস্তানের কাবুলে কুষাণ রাজগণ রাজত্ব করিতেন। হূনেরা কাবুল দখল করিয়াছিল এবং ক্রমশঃ হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে উপনীত হয়। এই হূনদলই ইতিহাসে শ্বেতহূন নামে পরিচিত।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত সম্রাট কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে ভারতে হূন আক্রমণের সূচনা হইয়াছিল। ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে স্কন্দগুপ্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যে হূন আক্রমণ সাময়িকভাবে প্রতিহত করেন, কিন্তু হূনেরা কিছুকাল পরে পুনরায় আক্রমণ চালাইয়া ৪৬৫ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধার রাজ্য (পেশোয়ার) দখল করে। ক্রমে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পশ্চিম অঞ্চল তাহাদের দখলে চলিয়া গিয়াছিল। সেই সময় হূন নেতা তোরমানের নেতৃত্বে হূনেরা উত্তর ও মধ্য ভারতের এরন পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল দখল করে। তোরমান "মহারাজাধিরাজ" উপাধি লইয়াছিলেন।

হূন আক্রমণের গুরুত্ব ঃ ভারত-ইতিহাসে হূনজাতির ভারত আক্রমণ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমতঃ, তাহাদের ক্রমাগত আক্রমণে ভারতের রাজনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, ফলে হূন আক্রমণ উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, অনেকের ধারণা হূন ও ভারতীয়দের সংমিশ্রণে ভারতে একটি নূতন জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল যাহারা কালক্রমে রাজপুত জাতি নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করে। তৃতীয়তঃ, আক্রমণকারীদের

প্রভাব হইতে ভারতীয় সমাজকে রক্ষাকল্পে ঐ সময় ভারতে জাতিভেদ প্রথায় কঠোরতা অবলম্বনের নীতি প্রবর্তিত হয়।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঃ হূন আক্রমণই গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করিয়াছিল। কারণ তাহাদের পুনঃপুনঃ আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল।

গুপ্তবংশের শেষ উল্লেখযোগ্য সম্রাট ছিলেন বুধগুপ্ত। তাঁহার আমলে বাংলা হইতে মালব পর্যন্ত গুপ্তশাসন অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু সাম্রাজ্যের পশ্চিম ভাগের প্রদেশগুলি ইতিমধ্যেই হূন আক্রমণের ফলে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

বুধগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্ত সাম্রাজ্য অতি দ্রুত অবনতির পথে অগ্রসর হইল। বাংলা, কনৌজ, সুরাষ্ট্র প্রভৃতি স্থানের নৃপতিগণ স্বাধীন হইয়া গেলেন।

হর্ষবর্ধনের যুগ

সূচনা ঃ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট হইয়াছিল। সেই সময় উত্তর ভারত কতিপয় খণ্ড-রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সকল রাজন্যবর্গের ভিতর আত্মপ্রাধান্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তদানীন্তন পরিস্থিতিতে কেবলমাত্র আঞ্চলিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল। সেইহেতু গুপ্তোত্তর যুগে প্রাদেশিক শক্তিগুলি জোরদার হইয়া উঠে।

প্রাদেশিক শক্তির উত্থান

উত্তর ভারতে এই সময় প্রধান চারিটি রাজ্য ছিল—মগধের গুপ্তবংশ, মৌখরিবংশ, পুষ্যভূতিবংশ ও মৈত্রকবংশ। এই সকল রাজ্যের মধ্যে পুষ্যভূতিবংশের উত্থান যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এই বংশের সম্রাট হর্ষবর্ধন কনৌজকে কেন্দ্র করিয়া উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য পুনঃস্থাপনে ব্রতী হইয়াছিলেন।

মৌখরি ও পুষ্যভূতিবংশ

হর্ষবর্ধন ঃ হর্ষবর্ধনের পিতা প্রভাকরবর্ধন ছিলেন পুষ্যভূতিবংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য নৃপতি। হর্ষ ছিলেন পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম রাজ্যবর্ধন। হর্ষবর্ধনের ভগিনী রাজ্যশ্রীর সহিত মৌখরিরাজ গ্রহবর্মার বিবাহ হইয়াছিল। পিতার মৃত্যু হইলে প্রথমে জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঠিক এই সময় সংবাদ আসিল যে, মালব-রাজ দেবগুপ্ত তাঁহার ভগ্নিপতী গ্রহবর্মাকে হত্যা করিয়াছেন এবং ভগিনী রাজ্যশ্রী বন্দিনী হইয়াছেন। স্বভাবতই রাজ্যবর্ধন মালব অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি মালবরাজ দেবগুপ্তকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পথে মালবরাজের মিত্র গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের হস্তে নিহত হন। এমতাবস্থায় ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

হর্ষের সিংহাসন লাভের পটভূমিকা



হর্ষবর্ধন

হর্ষ ছিলেন থানেশ্বরের অধিপতি, কিন্তু তাঁহাকে কনৌজের অধিশ্বররূপে বর্ণনা করা হয়। বাস্তবিকপক্ষে ভগিনী রাজ্যশ্রীকে উদ্ধারের পর ৬১২ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধন তাঁহার রাজধানী থানেশ্বর হইতে কনৌজে স্থানান্তরিত করেন।

কনৌজে রাজধানী স্থাপন

যাহা হউক, ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া হর্ষ প্রথমেই ভগিনী রাজ্যশ্রীকে উদ্ধারের নিমিত্ত বহির্গত হন, কারণ রাজ্যশ্রী ইতিমধ্যে নিরুদ্দিষ্টা হইয়াছিলেন। অচিরেই তিনি বিন্ধ্যারণ্যে ভগিনীর সন্ধান পান। অতঃপর হর্ষ ভ্রাতৃহন্তা গৌড়রাজ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই যুদ্ধে সাফল্যলাভের উদ্দেশ্যে তিনি কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধগ্রন্থ 'মঞ্জুশ্রী মূলকল্প' অনুযায়ী হর্ষ শশাঙ্কের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন এবং এমন কি, পরাজিত শশাঙ্কের পক্ষে দেশের বাহিরে গমন নিষিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু

শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা

আধুনিক ঐতিহাসিকগণের মতে হর্ষ সম্ভবত শশাঙ্কের কোন ক্ষতি করিতে সমর্থ হন নাই। কারণ ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শশাঙ্ক যে সগৌরবে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন তাহার প্রমাণ আছে।

ধ্রুবসেনের পরাজয়

হর্ষ সৌরাষ্ট্রের (গুজরাট) বলভীরাজ ধ্রুবসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই যুদ্ধে ধ্রুবসেন পরাস্ত হইয়া হর্ষের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তবে ধ্রুবসেন পরে সম্ভবত গুর্জররাজের সহায়তায় স্বীয় রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। হর্ষচরিত অনুযায়ী হর্ষ সিন্ধুদেশের বিরুদ্ধেও যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পুলকেশীর সহিত যুদ্ধ

হর্ষবর্ধন দক্ষিণ ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সেনাবাহিনীসহ নর্মদাতীরে উপস্থিত হইলে চালুক্য-রাজ দ্বিতীয় পুলকেশী তাঁহার গতিরোধ করেন। এই যুদ্ধে হর্ষ পরাজিত হইয়াছিলেন। ফলে নর্মদা নদীই দুই রাজ্যের রাজ্যসীমা হইল।

হর্ষের সাম্রাজ্য-সীমা

হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যসীমা লইয়া ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে মতভেদের অন্ত নাই। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী হর্ষবর্ধনকে 'সকলোত্তরপথনাথ' বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। সেইমত অনেকেই হর্ষবর্ধনকে সমগ্র উত্তর ভারতের সম্রাট বলিয়া অভিহিত করেন। তবে আধুনিক ঐতিহাসিকদিগের অধিকাংশের মত অনুযায়ী পূর্ব পাঞ্জাব, গাঙ্গেয় দোয়াব, রোহিলখণ্ড, মগধ, পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যা তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। ইহা ছাড়া কাশ্মীর, নেপাল, জলন্ধর ও বলভীর সামন্ত রাজগণ তাঁহার আজ্ঞাবহ ছিলেন। যাহা হউক, হর্ষ উত্তর ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে স্বীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছিলেন। ৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষের মৃত্যু হয়।

হিউয়েন সাঙ ঃ হর্ষের রাজত্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘটনা হিউয়েন সাঙের ভারত-আগমন। তিনি ছিলেন একজন চৈনিক পরিব্রাজক। মূল বৌদ্ধশাস্ত্র

বিষয়ে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে তিনি ভারতে আসিয়াছিলেন। ৬৩০ হইতে ৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ভারতের নানা বৌদ্ধ তীর্থ পর্যটন করেন এবং ভারতের তৎকালীন আচার-ব্যবহারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। তিনি এদেশের একটি সুন্দর বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন।

ভারত-আগমনের উদ্দেশ্য—বিবরণী



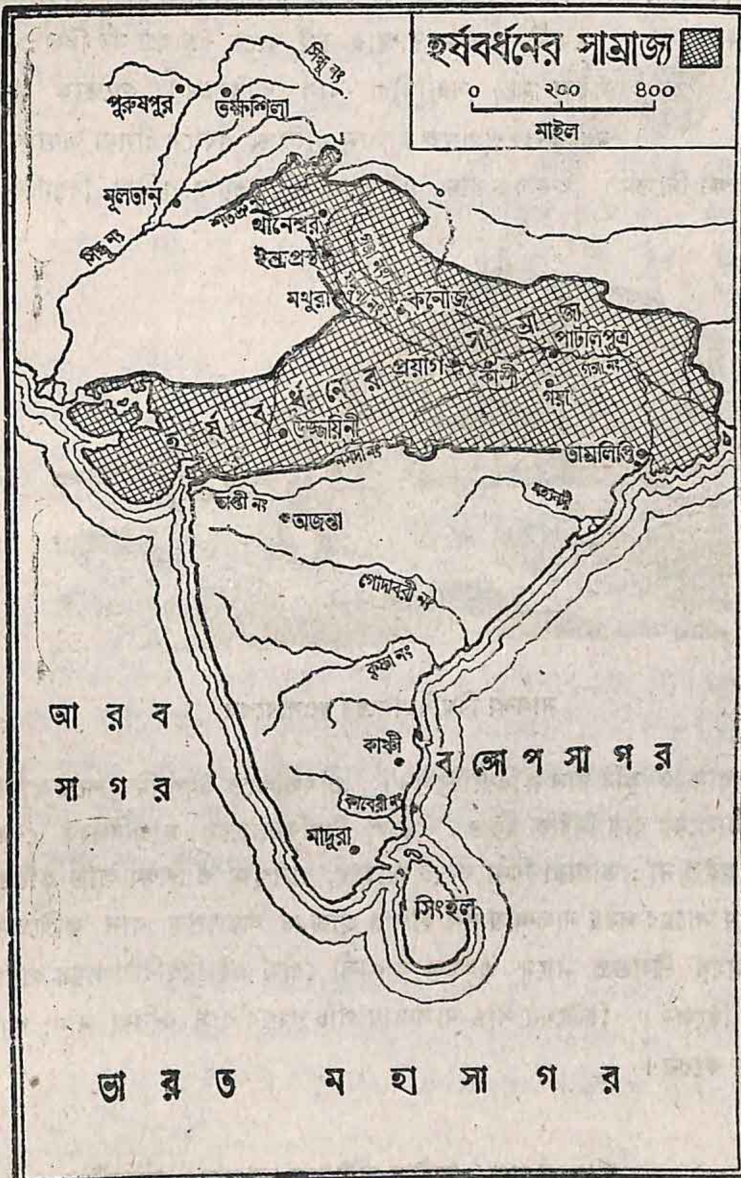
হিউয়েন সাঙ

তিনি লিখিয়াছেন যে, হর্ষের রাজধানী কনৌজ একটি সুন্দর ও সুরক্ষিত নগর ছিল। হর্ষের রাজ্য হইতে জীবহিংসা ও মাংসাহার উঠিয়া গিয়াছিল। সম্রাট বৌদ্ধমঠ নির্মাণের জন্য অকাতরে অর্থ-দান করিতেন। রাজ্যের শাসনকার্য ঠিকমত চলিতেছে কিনা দেখিবার জন্য হর্ষ রাজ্যের সর্বত্র পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেন। বণিক ও পথিকদের সুবিধার জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। হর্ষের আমলে দণ্ডবিধি গুপ্তযুগ অপেক্ষা কঠোর ছিল, কিন্তু গুপ্তবংশের শাসনকালে পথঘাট যত নিরাপদ ছিল, হর্ষের সময়ে ততটা ছিল না। হিউয়েন সাঙ নিজেও কয়েকবার দস্যুর হাতে পড়িয়াছিলেন।

হর্ষের রাজধানী ও রাজ্যশাসন

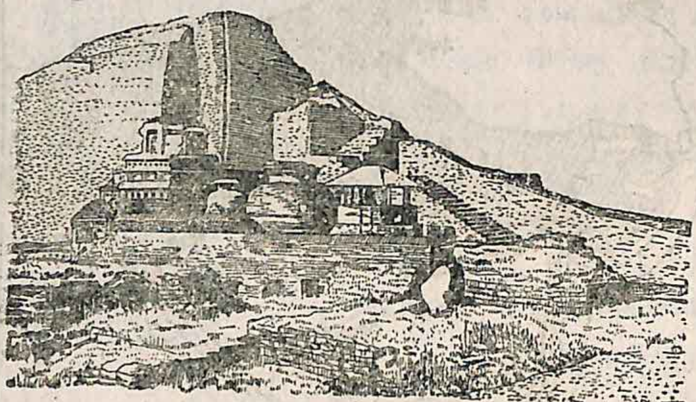
হিউয়েন সাঙের সম্মানার্থ হর্ষ কনৌজে এক বিশেষ বৌদ্ধ সভা আহ্বান করেন। অতঃপর হর্ষ হিউয়েন সাঙকে প্রয়াগের মেলায় আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। হিউয়েন সাঙ ঐ দুইটি ঘটনারও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন।

পাটলিপুত্র নগর তখন ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। তবে পাটলিপুত্রের কিছু দক্ষিণে নালন্দা নামক স্থানে একটি প্রকাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। বর্তমান পাটনা জেলার অন্তর্গত বড়গাঁও নামক স্থানে নালন্দার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে।


হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য
০ ২০০ ৪০০
মাইল
পুরুষপুর
তক্ষশিলা
মূলতান
থানেশ্বর
ইন্দ্রপ্রস্থ
মথুরা
কনোজ
পাটলিপুত্র
প্রয়াগ
কাশী
গয়া
উজ্জয়িনী
তাম্রলিপ্তি
অজন্তা
গোদাবরী নং
কৃষ্ণা নং
কাঞ্চী
কাবেরী নং
মাদুরা
সিংহল
আ র ব
সা গ র
ব ঙ্গো প সা গ র
ভা র ত ম হা সা গ র

সুদূর চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হইতে বহু ছাত্র আসিয়া নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত। একটি প্রশস্ত রাস্তার দুই ধারে বড় বড় মঠ ছিল ; এই সকল মঠে সন্ন্যাসীরা বাস করিতেন। প্রত্যেক মঠের মধ্যভাগে সুপ্রশস্ত দালান থাকিত, এখানে বসিয়া অধ্যাপকগণ শিক্ষা দিতেন। বড় বড় রাজা এই সকল মঠ তৈয়ার করিয়া দিয়াছিলেন

নালন্দা



নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ

এবং গ্রাম ও ভূমি দান করিয়াছিলেন। গ্রামগুলিতে উৎপাদিত শস্যের অর্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ হইত। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে বেতন দিতে হইত না ; তাহারা বিনা খরচে আহার, বাসস্থান ও শিক্ষা লাভ করিত। হিউয়েন সাঙের সময় নালন্দায় দশ হাজার ছাত্র ও অধ্যাপক বাস করিতেন। সেই সময় শীলভদ্র নামে একজন বাঙালী বৌদ্ধ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন। হিউয়েন সাঙ নালন্দায় পাঁচ বৎসর বাস করিয়া নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

(খ) হর্ষোত্তর যুগ (অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী)

সূচনা ঃ হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর (৬৪৬-৬৪৭ খ্রীঃ) সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিয়াছিল। অতঃপর উত্তর ভারতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব

হয়। এই সব রাজ্যের রাজারা নিজেদের রাজপুত বলিয়া পরিচয় দিতেন।

রাজপুত জাতির পরিচয়

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, রাজপুতগণ প্রাচীন ভারতের সুপ্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় বংশ হইতে উদ্ভূত, আবার কেহ কেহ বলেন, শক, হূন, গুর্জর প্রভৃতি যে-সকল বৈদেশিক জাতি ভারতে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল কালক্রমে তাহাদের সহিত ভারতীয়দের সংমিশ্রণের ফলেই রাজপুত জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল।

রাজপুত বংশগুলির ভিতর গুর্জর-প্রতিহার বংশই ছিল সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজা নাগভট গুর্জর-প্রতিহার রাজ্য স্থাপন করেন। মিহির ভোজ ছিলেন এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট। তিনি কনৌজ দখল করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করেন এবং সমগ্র উত্তর ভারতে নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হন। দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রতিহার সাম্রাজ্যের অবসান হয়।

গোষ্ঠীভিত্তিক সামন্ত রাজ্যের অভ্যুদয় ঃ প্রতিহার সাম্রাজ্যের পতনের যুগে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে উত্তর ভারতে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর রাজপুত রাজগণ কতিপয় রাজ্য স্থাপন করেন। বিহারের পশ্চিম হইতে সমগ্র উত্তর ভারতে এই সকল রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহাদের ভিতর চন্দেল্লবংশ, পরমারবংশ এবং চৌহান ও গাহড়বালবংশ বিশেষত উল্লখযোগ্য।

চন্দেল্লবংশ ঃ প্রতিহার সাম্রাজ্যের পতনের পর বুন্দেলখণ্ডে চন্দেল্ল বংশের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত চন্দেল্লগণ বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন। চন্দেল্লগণের প্রধান কীর্তি হইল খাজুরাহের সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরসমূহ।

পরমারবংশ ঃ দশম ও একাদশ শতাব্দীতে মালবের পরমারবংশ পুরাতন উজ্জয়িনীর প্রায় পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে ধারা নগরীতে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহারা প্রায় তিনশত বৎসর রাজত্ব করেন।

সাম্ভারের চৌহানবংশ ঃ রাজপুতানার সাম্ভার নামক স্থানে চৌহানবংশ বহুকাল ধরিয়া রাজত্ব করিত। একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অজয়দেব এই বংশের শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিয়া অজয় মেরু বা বর্তমান আজমীড় নগর প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে আজমীড় ও দিল্লী চৌহানদের প্রধান ঘাঁটি হইয়াছিল। তৃতীয় পৃথ্বীরাজ ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি, সমরকুশলী নেতা, শৌর্যবীর্যের প্রতিমূর্তি এবং একাধারে প্রেম ও বীরত্বের আধার। তিনি বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্ল শক্তি বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তুর্কী বীর মুহম্মদ ঘোরীকে ভীষণভাবে পরাজিত করেন, কিন্তু পরবৎসর বিপক্ষের সমরচাতুর্যে পরাস্ত হইয়া নিহত হন।


পৃথ্বীরাজ

কনৌজের গাহড়বালবংশ ঃ একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে গাহড়বাল নামে এক রাজপুতবংশ কনৌজ অধিকার করে। এই রাজবংশ কাশীতে রাজধানী স্থাপন করিয়া গঙ্গা ও যমুনার দোয়াব অঞ্চলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। ক্রমে তাহারা বিহার দখল করে। এই বংশের শেষ রাজা জয়চন্দ্র ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি কুতুবুদ্দীনের হস্তে পরাজিত হন।

ত্রিশক্তি সংগ্রাম ঃ হর্ষোত্তর যুগে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ত্রিশক্তি সংগ্রামই ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। হর্ষবর্ধন কনৌজে রাজধানী স্থাপন করিয়া উত্তর ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। স্বভাবতই সেই সময় হইতে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক শক্তি-কেন্দ্র হিসাবে কনৌজের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ফলে কনৌজের আধিপত্য লাভই হইল উত্তর ভারতে আধিপত্য স্থাপনের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। সেইহেতু অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে গৌড় বঙ্গের পালবংশ, রাজপুতানার গুর্জর-প্রতিহারবংশ এবং

দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটবংশের রাজগণ কনৌজের উপর আধিপত্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে এক তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত কনৌজকে কেন্দ্র করিয়া এই সংঘর্ষ অব্যাহত ছিল।

ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যের অভাব : মোটামুটিভাবে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রাজপুত সামন্তরাজগণই উত্তর ভারতের বিভিন্নাংশে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। ইতিপূর্বে উত্তর ভারতের প্রতিহারবংশই ছিল বিশেষ পরাক্রমশালী। ত্রিশক্তি সংগ্রামের সর্বশেষ বিজেতাও ছিল এই প্রতিহার রাজবংশ। এমন কি, তাহাদের সাম্রাজ্যের আয়তনও হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য অপেক্ষা বৃহত্তর ছিল। বৈদেশিক আক্রমণ, বিশেষত আরবদের বিরুদ্ধেও তাহারা ক্রমাগত আক্রমণ চালাইয়া ঐ আক্রমণ প্রতিহত করিতে সমর্থ হইয়াছিল;

রাজনৈতিক অনৈক্য

কিন্তু কনৌজকে কেন্দ্র করিয়া ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে পাল, রাষ্ট্রকূট ও প্রতিহার—এই তিন রাজবংশই সামরিকভাবে দুর্বল হইয়া পড়ে। ফলে ঐ তিন রাজ্যের সামন্তরাজারা সমগ্র উত্তর ভারতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল।

এই রাজ্যগুলির মধ্যে অধিকাংশই ছিল রাজপুত সামন্ত রাজ্য—যথা, চন্দেল্ল, চৌহান, পরমার ও গাহড়বাল প্রভৃতি রাজবংশ। ইহা ছাড়া সেই সময় মগধ ও বঙ্গে পাল ও সেনবংশ, পাঞ্জাবে শাহীবংশ এবং উড়িষ্যায় গঙ্গবংশ রাজত্ব করিত। তাই দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উত্তর ভারতে কোন ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য ছিল না, অধিকন্তু এই সকল রাজ্যের রাজগণ ছিলেন খুবই ঈর্ষাপরায়ণ ও পরস্পর আত্মকলহে লিপ্ত।

(গ) বাংলার ইতিহাস

গৌড়রাজ শশাঙ্ক : বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বহরমপুরের নিকটে কর্ণসুবর্ণ নামে একটি শহর ছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে শশাঙ্ক এই কর্ণসুবর্ণে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। বাণভট্ট রচিত 'হর্ষচরিতে' এই রাজাকে 'গৌড়াধিপতি' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। গৌড় বলিতে প্রধানতঃ উত্তরবঙ্গ এবং কখনও কখনও উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গকে বুঝাইত।

বাঙালী রাজগণের মধ্যে শশাঙ্কই প্রথম স্বাধীন রাজা। তাঁহার জন্মস্থান, বাল্যজীবন বা বংশ পরিচয় সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কিভাবে তিনি গৌড়ের সিংহাসন লাভ করেন তাহাও অজ্ঞাত। তাঁহার নাম লেখা একটি শিলালিপিতে তাঁহাকে "শ্রীমহাসামন্ত" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে গুপ্তরাজ মহাসেনগুপ্ত মগধ ও গৌড়ের অধিপতি ছিলেন। প্রথম জীবনে শশাঙ্ক হয়তো এই গুপ্তরাজার সামন্ত ছিলেন। মহাসেনগুপ্তের মৃত্যুর পর তিনি সম্ভবতঃ পুণ্ড্রবর্ধন অধিকার করেন। তিনি একদিকে উড়িষ্যার কিছু অংশ এবং অন্যদিকে বারাণসী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। দণ্ডভুক্তি (মেদিনীপুর) এবং মগধ তিনি জয় করেন। দক্ষিণে বঙ্গরাজ্যটিও তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করে। এইভাবে রাজ্যবিস্তার করিয়া শশাঙ্ক উত্তর ভারতে স্বীয় প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতে অগ্রসর হইলেন।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর মৌখরি রাজবংশ উত্তর ভারতে পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। শশাঙ্ক এই মৌখরিদের সহিত শক্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তখন কনৌজে মৌখরিবংশের রাজা ছিলেন গ্রহবর্মা। তিনি থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এদিকে কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মা শশাঙ্কের শক্তিবৃদ্ধিতে ভীত হইয়া থানেশ্বরের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলেন। এইভাবে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে কনৌজ, থানেশ্বর এবং কামরূপ এই তিন শক্তি মিলিত হইল। এই মিলিত শক্তিকে পরাস্ত করিবার জন্য শশাঙ্ক মালবরাজ দেবগুপ্তের সহিত মিলিত হইলেন। কারণ থানেশ্বরের পুষ্যভূতিবংশের সহিত মালব রাজবংশের বহুকাল ধরিয়া বিরোধ চলিয়া আসিতেছিল।

এই সব রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধের কারণ ও প্রথম দিকের ঘটনা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। শশাঙ্ক সম্ভবত প্রথমে বারাণসী অধিকার করিয়া পশ্চিমদিকে অগ্রসর হন। দেবগুপ্তও মালব হইতে কনৌজের দিকে যাত্রা করেন। 'হর্ষচরিত' অনুযায়ী এই সময় থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। এমন সময় রাজ্যবর্ধন খবর পাইলেন যে, মালবরাজ দেবগুপ্ত গ্রহবর্মাকে হত্যা করিয়াছেন;

এবং ভগিনী রাজ্যশ্রীকে বন্দিনী করিয়া রাখা হইয়াছে। এই সংবাদে রাজ্যবর্ধন তৎক্ষণাৎ যুদ্ধযাত্রা করিলেন এবং যুদ্ধে দেবগুপ্ত পরাজিত হইলেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি গৌড়রাজ শশাঙ্কের হস্তে নিহত হইলেন।

রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন কনৌজ ও থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ইহার ফলাফল সঠিক জানা যায় না। তবে ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে শশাঙ্ক যে গৌড়ে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। আনুমানিক ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে শশাঙ্কের মৃত্যু হয়।

ধর্ম ঃ শশাঙ্ক ছিলেন শিবের উপাসক। তাঁহার মুদ্রায় বৃষভ-বাহন মহাদেবের মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ বলিয়াছেন যে, শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্মের ঘোর শত্রু ছিলেন। কথিত আছে যে, শশাঙ্ক বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষটি ছেদন করিয়াছিলেন এবং তিনি নাকি গৌতম বুদ্ধের পদচিহ্ন অঙ্কিত শিলাটি বিনাশ করিতে না পারিয়া উহা গঙ্গাজলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাও জানা যায় যে, শশাঙ্কের রাজত্বকালে রাজধানী কর্ণসুবর্ণ এবং রাজ্যের অন্যান্য স্থানে বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও মর্যাদা ছিল।

পাল ও সেন যুগে বাংলার সমাজ, ধর্ম ও শিক্ষাদীক্ষা

সূচনা ঃ শশাঙ্কের মৃত্যুর পর এক শতাব্দী ধরিয়া গৌড়বঙ্গে অরাজকতা চলে। অতঃপর পাল ও সেনবংশের রাজত্বকালে দেশের খুব উন্নতি হইয়াছিল। দিগ্বিজয়ী পালসম্রাট ধর্মপাল ও দেবপাল বাংলাদেশকে ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করেন। অন্যদিকে দীর্ঘস্থায়ী সুশাসন ও অভ্যন্তরীণ শান্তি এবং শৃঙ্খলা বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এক চরম উন্নতির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিল। পালবংশের ন্যায় সেনবংশ অবশ্য দীর্ঘকাল বাংলাদেশে রাজত্ব করে নাই। কিন্তু বাংলার সমাজ ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে সেনযুগ অন্যতম শ্রেষ্ঠযুগ হিসাবে বিবেচিত হয়।

সামাজিক অবস্থা ঃ পাল ও সেন রাজাদের সময়ে বাঙালীরা খুব সহজ ও সরল জীবন যাপন করিত। প্রায় সকলেই গ্রামে বাস করিত। ডাল-ভাত,

মাছ-মাংস, শাক-সবজি, দধি-দুগ্ধ প্রভৃতি তাহাদের খাদ্য ছিল। পুরুষেরা খাটো ধুতি ও মেয়েরা বড় শাড়ী পরিত। পুরুষদের ধুতি হাঁটুর নীচে নামিত না, কিন্তু মেয়েদের চওড়া শাড়ী গোড়ালি পর্যন্ত নামিত। পুরুষদের উর্ধ্বাঙ্গ খোলা থাকিত। কিন্তু মেয়েরা শাড়ীর এক অংশ দিয়া উর্ধ্বাঙ্গ ঢাকিয়া রাখিত। কখনও কখনও পুরুষেরা চাদর ও মেয়েরা ওড়না এবং খাটো জামা ব্যবহার করিত। উৎসবে বা বিশেষ কাজকর্মে বিশেষ পরিচ্ছদের ব্যবস্থা ছিল।

খাদ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ

পুরুষ ও মেয়েরা হাতে বালা বা কেয়ূর, আঙুলে অঙ্গুরী, কানে কুণ্ডল ও গলায় হার পরিত। কেবল মেয়েরাই হাতে শঙ্খ, কটিদেশে মেখলা ও পায়ে মল পরিত। ধনীরা সোনা, রূপা ও মণিমুক্তার অলঙ্কার ব্যবহার করিত। বাঙালীরা পাগড়ি বা শিরোভূষণ ব্যবহার করিত না, কিন্তু খড়ম ও চামড়ার জুতা ব্যবহার করিত।

অলঙ্কার

সমাজে নারীর স্থান খুব উচ্চে ছিল। তখন পরদা-প্রথার প্রচলন ছিল না। মেয়েরা কর্পূর, চন্দন প্রভৃতি প্রসাধন ব্যবহার করিত। মেয়েরা লেখাপড়া শিখিত। পুরুষেরা বহু-বিবাহ করিত, কিন্তু বিধবা-বিবাহ সমাজে নিন্দিত ছিল।

নারীর স্থান

সামাজিক জীবন গ্রাম-ভিত্তিক হইলেও সম্ভ্রান্ত ও ধনীদের মধ্যে অনেকে শহরে বসবাস করিত। তখন বাংলাদেশে জনাকীর্ণ, সম্পদশালী শহরেরও অভাব ছিল না। রামপাল প্রতিষ্ঠিত পাল রাজধানী 'রামাবতী' নগরী সম্পর্কে সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতে' অতি সুন্দর বর্ণনা আছে।

শহর-নগর

খেলাধূলা ও বিভিন্ন আমোদ-প্রমোদেরও ব্যবস্থা ছিল। বার মাসে তের পার্বণ লাগিয়াই থাকিত। দুর্গাপূজা, দোল ও জন্মাষ্টমীতে খুব ধুম হইত। এই সমস্ত পূজা উপলক্ষে মেলা বসিত। ঢাক, ঢোল, বাঁশি, কাঁসর ও করতালের শব্দে উৎসবের দিন মুখরিত হইয়া উঠিত।

খেলাধূলা ও উৎসব

সেন রাজগণ মনুসংহিতার আদর্শে সমাজ গঠনে ব্রতী হন। বৌদ্ধধর্ম প্রসারের ফলে সমাজ-জীবনে যে শিথিলতা দেখা দিয়াছিল তাহা দমন করাই ছিল তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এইজন্য সেন রাজগণ জাতিভেদ প্রথায়

কঠোরতা আনয়ন করেন। স্মৃতিশাস্ত্র দ্বারা সমাজ নিয়ন্ত্রিত হইতে শুরু করে।

জাতিভেদ-প্রথার কঠোরতা ও কৌলীন্য-প্রথা প্রবর্তন

সমাজে বিবাহ প্রভৃতি আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে বল্লাল সেন কৌলীন্য-প্রথার প্রবর্তন করেন। প্রতি ছত্রিশ বৎসর অন্তর কুলীনদের নির্বাচন হইবে বলিয়া তিনি স্থির করেন। ইহাতে অ-কুলীন সদাচারী ব্যক্তি কৌলীন্যের মর্যাদা লাভ করিতে পারিত। সেইরূপ অযোগ্য কুলীনকেও কৌলীন্য মর্যাদাচ্যুত করা যাইত। পরে কৌলীন্য-প্রথা বংশপরম্পরায় চলিতে থাকিবে বলিয়া স্থির করা হয়। এই কৌলীন্য-প্রথা আজিও বাংলাদেশে প্রচলিত আছে। এ-যুগের সমাজ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গন্ধবণিক, তন্তুবায়, ক্ষৌরকার, মালাকার প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল।

ধর্ম ঃ পালরাজারা ছিলেন মহাযানপন্থী বৌদ্ধ। তাঁহাদের আমলে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম যথেষ্ট প্রসারলাভ করে, কিন্তু বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হইলেও

পালযুগ

পালরাজারা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মাচরণে কোন অসুবিধার সৃষ্টি করেন নাই। সমাজে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদের যথেষ্ট মর্যাদা ছিল। ব্রাহ্মণগণ রাজদরবারে উচ্চ রাজকর্মচারীর পদ লাভ করিতেন এবং সে-যুগে বৈদিক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের উল্লেখ পাওয়া যায়, বিষ্ণু ও শিবের ভক্তগণও পালযুগে রাজানুগ্রহ লাভ করিত।

দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটক বংশ হইতে উদ্ভূত হইয়া সেনরাজগণ বাংলায় পৌরাণিক ও বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। বিজয় সেন, বল্লাল সেন উভয়েই ছিলেন শৈবধর্মাবলম্বী। লক্ষ্মণ সেন ছিলেন পরম বৈষ্ণব।

সেনযুগ

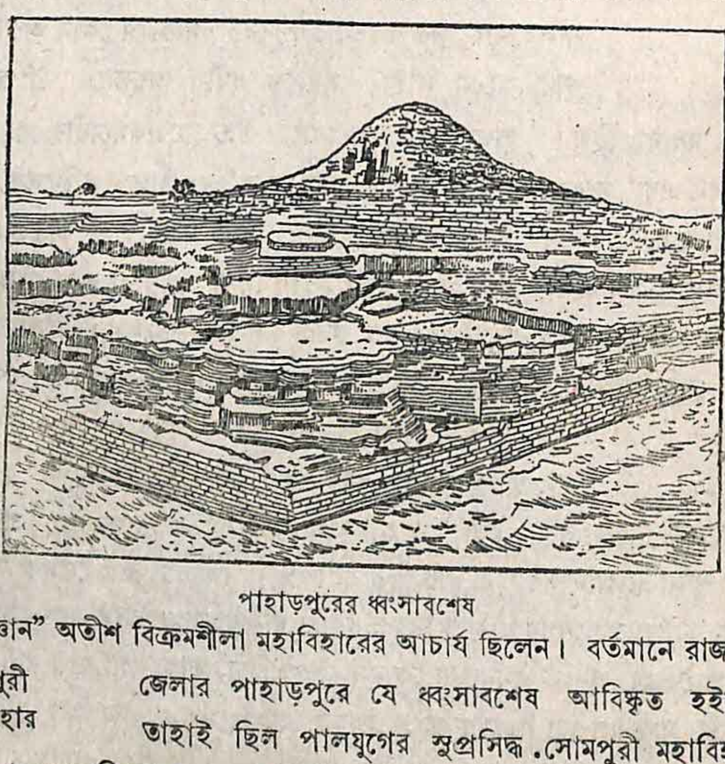
এই অবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষে নিন্দা ও অপপ্রচার দ্বারা সেনরাজগণ বৌদ্ধদের উৎপীড়ন করিবার চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। ইহা ভিন্ন সেনযুগে রচিত স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের সুনির্দিষ্ট আদর্শের কথা প্রচারিত হইয়াছে। বেদচর্চা এবং বৈদিক যজ্ঞাদি সমাপ্ত করিয়া ব্রাহ্মণগণ রাজার নিকট হইতে দক্ষিণা স্বরূপ জমি লাভ করিত। শৈব ও বৈষ্ণব এই দুই ধর্মমতের কোন্‌টি প্রবল ছিল, তাহা বলা যায় না। তবে যে-সমস্ত মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে বৈষ্ণবধর্মের প্রাধান্য ছিল বলিয়াই মনে হয়। সেনযুগে বিষ্ণু, শিব, পার্বতী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল।

শিক্ষাদীক্ষা ঃ পালযুগে গোপালের রাজত্বকালে ওদন্তপুর মহাবিহার প্রসিদ্ধিলাভ করে। এখানে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র, দর্শন ইত্যাদি অধ্যয়নের ব্যবস্থা ছিল। পরীক্ষায় কৃতিত্বের ভিত্তিতে এখানে ছাত্ররা ভর্তি হইত এবং মেধাবী ছাত্রগণকে কোন বেতন দিতে হইত না। এখানে একটি বিখ্যাত গ্রন্থাগারও ছিল।

ওদন্তপুর মহাবিহার

গোপালের পুত্র সম্রাট ধর্মপাল বর্তমান ভাগলপুরের নিকট গঙ্গাতীরে সুপ্রসিদ্ধ বিক্রমশীলা মহাবিহার নির্মাণ করেন। তিব্বত, নেপাল প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান এবং ভারতের নানা স্থান হইতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভের জন্য এখানে আসিতেন। তিন হাজার বিদ্যার্থীর অধ্যয়ন ও বাস করিবার ব্যবস্থা এখানে ছিল। এই মহাবিহারে ১০৭টি মঠ ও ৬টি মহাবিদ্যালয় ছিল। বৌদ্ধশাস্ত্র, ন্যায়, ব্যাকরণ, তর্কবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে এখানে শিক্ষা দেওয়া হইত। দীপঙ্কর

বিক্রমশীলা মহাবিহার



পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষ

"শ্রীজ্ঞান" অতীশ বিক্রমশীলা মহাবিহারের আচার্য ছিলেন। বর্তমানে রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরে যে ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাই ছিল পালযুগের সুপ্রসিদ্ধ সোমপুরী মহাবিহার। পালরাজগণ সুবিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্যও চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সোমপুরী মহাবিহার

(ঘ) দক্ষিণ ভারত

চালুক্য, পল্লব ও চোলদের ইতিহাস

সূচনা : মৌর্যোত্তর যুগে সাতবাহন বংশের নরপতিগণ দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়া দীর্ঘ চারিশত বৎসর রাজত্ব করেন। সাতবাহন বংশের পতনের প্রায় তিনশত বৎসর পরে বাতাপী বা বাদামী নগরীর চালুক্যগণ দাক্ষিণাত্যে একটি বিস্তীর্ণ রাজ্য স্থাপন করেন।

বাতাপীর চালুক্য বংশ : কতকগুলি শিলালিপিতে চালুক্য রাজগণ নিজেদের সূর্যবংশসম্ভূত বলিয়া দাবী করিয়াছিলেন। কেহ কেহ আবার তাহাদের হূন, গুর্জর প্রভৃতি বৈদেশিক জাতির বংশধর বলিয়া মনে করেন। সম্ভবতঃ তাহারা ছিল দেশীয় কোন ক্ষত্রিয় বংশের সন্তান এবং অযোধ্যা হইতে দাক্ষিণাত্যে আগমন করে। অতঃপর প্রথমে তাহারা উত্তর কর্ণাটকের বাতাপী বা বাদামী অঞ্চল ও নিকটবর্তী আইহোল অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করে।

বংশ পরিচয়

চালুক্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম পুলকেশী। তিনি কয়েকটি রাজ্য জয় করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাঁহার পৌত্র দ্বিতীয় পুলকেশী ছিলেন এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি। তিনি ৬২০ হইতে ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন এবং উত্তর ভারতে সম্রাট হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক ছিলেন।

প্রথম পুলকেশী

বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া দ্বিতীয় পুলকেশী চালুক্য-শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার বিশাল পরাক্রমে উত্তরে লাট ও গুর্জরগণ পরাস্ত এবং বিধ্বস্ত হইল, উত্তর ভারতের পরাক্রান্ত সম্রাট হর্ষবর্ধনের দাক্ষিণাত্য বিজয়াভিযান নর্মদাতীরে প্রতিহত হইল; দক্ষিণভাগে পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মন পরাস্ত হইয়া রাজধানী কাঞ্চীর প্রাচীরের অন্তরালে আশ্রয় লইলেন। 'সুদূর' দক্ষিণে চোল, পাণ্ড্য ও কেরল প্রভৃতি রাজ্যের রাজগণ চালুক্যরাজের প্রভাব স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পুলকেশী—হর্ষবর্ধনের সহিত যুদ্ধ

চারিদিকে রাজ্য জয় করিয়া পুলকেশী চালুক্য সাম্রাজ্যের এত বিস্তার

সাধন করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণুবর্ধনকে সাম্রাজ্যের পূর্বভাগ শাসনের জন্য নিযুক্ত করেন। বিষ্ণুবর্ধন বেঙ্গী নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া নিজেকে স্বাধীন নৃপতি বলিয়া প্রচার করিলেন। এইরূপে বেঙ্গীতে পূর্ব-চালুক্যবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

পূর্ব-চালুক্যদের উত্থান

আরবদিগের বিবরণ এবং অজন্তা গুহার চিত্র হইতে জানিতে পারা যায় যে, দ্বিতীয় পুলকেশীর সহিত পারস্যরাজ দ্বিতীয় খস্রুর পত্রালাপ চলিত। ৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ চালুক্যরাজের একটি নগরী পরিদর্শন করিয়া পুলকেশীর রাজ্যের শান্তি ও সমৃদ্ধির কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার শাসনব্যবস্থা ও দানশীলতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। শত্রুর প্রতি নির্মম হইলেও তিনি উপকারীর প্রতি সদা কৃতজ্ঞ থাকিতেন। তিনি স্বয়ং ক্ষত্রিয় ও শৈব হইলেও বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতেন।

দ্বিতীয় পুলকেশীর কৃতিত্ব ও মহানুভবতা

পুলকেশীর রাজত্বের শেষদিকে পল্লবগণ পূর্ব-পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিল। ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে পল্লবরাজ নরসিংহবর্মার সহিত যুদ্ধে পুলকেশী পরাজিত ও নিহত হন।

পুলকেশীর মৃত্যুর তের বৎসর পরে তাঁহার পুত্র বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। মধ্যবর্তী এই ত্রয়োদশ বৎসর বাতাপী ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সম্ভবতঃ পল্লবদের অধীনে ছিল। বিক্রমাদিত্য পল্লব-রাজ নরসিংহবর্মাকে পরাজিত করিয়া পল্লবদের রাজধানী কাঞ্চী অধিকার করেন।

প্রথম বিক্রমাদিত্য

৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র বিনয়াদিত্যও পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন এবং বিভিন্ন রাজ্য জয় করিয়া বংশের গৌরব বৃদ্ধি করেন। তিনি 'সত্যাশ্রয়ী', 'শ্রীপৃথিবী বল্লভ' প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। বিনয়াদিত্যের পৌত্র দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য বহু প্রাসাদ ও মন্দির নির্মাণ করিয়া বিখ্যাত হন। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের পুত্র দ্বিতীয় কীর্তিবর্মন এই বংশের শেষ রাজা। ৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে

বিনয়াদিত্য—
অশ্বমেধ যজ্ঞ—
দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য

রাষ্ট্রকূটগণের আক্রমণে বাদামী বা বাতাপীর চালুক্যবংশের প্রাধান্য বিনষ্ট হইয়া যায়।

বাদামীর চালুক্যরাজগণ হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী হইলেও ধর্ম ব্যাপারে উদার মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহাদের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ধীরে ধীরে কমিয়া আসে এবং পৌরাণিক হিন্দুধর্ম জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

ধর্ম

কাঞ্চীর পল্লববংশ—খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমভাগে সাতবাহন সাম্রাজ্যের পতনের যুগে কাঞ্চীর পল্লববংশ দাক্ষিণাত্যের পূর্ব-উপকূলে কৃষ্ণানদীর তীরে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। ইহার প্রায় দেড়শত বৎসর পরে পল্লবরাজ বিষ্ণুগোপ সমুদ্রগুপ্তের বিজয়াভিযান প্রতিহত করিবার জন্য রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতে পল্লবগণ দাক্ষিণাত্যের একটি পরাক্রান্ত শক্তিতে পরিণত হয়। একদিকে চালুক্য ও রাষ্ট্রকূট অপরদিকে চোল রাজ্যের সহিত ইঁহাদের প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়া থাকিত। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মনকে (৬০০-৬০৩ খ্রীঃ) পরাস্ত করিয়া বেঙ্গী অধিকার করেন।

পল্লবগণের উত্থান

পল্লববংশের রাজগণের মধ্যে নরসিংহবর্মনই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি বাতাপীর চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীকে উপর্যুপরি তিনটি যুদ্ধে পরাস্ত করেন এবং রাজধানী বাতাপী লুণ্ঠন করিয়া বহু ধনরত্নসহ কাঞ্চীতে ফিরিয়া আসেন। "সুদূর দক্ষিণে" পাণ্ড্যদেশ ও সিংহল পর্যন্ত তাঁহার প্রাধান্য ছিল। তিনি সমুদ্রতীরে মহাবলীপুরম্ নামে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে বহু মন্দির নির্মাণ করেন। প্রখ্যাত চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ তাঁহার রাজত্বকালে রাজধানী কাঞ্চীনগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নবম শতাব্দীর শেষে চোলগণের সহিত অবিরাম সংঘর্ষের ফলে পল্লবগণের পতন হয়।

নরসিংহবর্মন

হিউয়েন সাঙ

শিল্প ও স্থাপত্যে চালুক্য ও পল্লব রাজগণের অবদান : দক্ষিণ ভারতের শিল্প ও স্থাপত্যের উন্নতিকল্পে চালুক্য ও পল্লব রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতা

বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ ভারতের লোকেশ্বরের মন্দির এবং আইহোলের সুপ্রসিদ্ধ বিষ্ণুমন্দির চালুক্য স্থাপত্য-শিল্পের মনোরম নিদর্শন। ইহা ছাড়া চালুক্যরাজগণের প্রচেষ্টার ফলে সুবিখ্যাত অজন্তা গুহায় কিছু শিল্প সংযোজন করা হইয়াছিল। তথাপি শিল্প ও স্থাপত্য তাঁহাদের চিরাচরিত প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি পল্লবগণের শ্রেষ্ঠত্ব চালুক্যদের শিল্প-কীর্তিকে ম্লান করিয়া দিয়াছিল।

আইহোলের বিষ্ণু-মন্দির ও অজন্তা গুহা

সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে পল্লবরাজ নরসিংহবর্মন মহামল্ল বর্তমান মাদ্রাজের নিকটে সমুদ্রতীরে মহাবলীপুরম্ নামে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন এবং পর্বতের খাড়া পাথর কাটিয়া সাতটি গুহামন্দির নির্মাণ করিয়া নগরটিকে সুশোভিত করেন, এই মন্দিরগুলি দেখিতে রথের মত বলিয়া উহাদিগকে রথ বলা হয়। এক-একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড কাটিয়া এক-একটি রথ নির্মিত হইয়াছে; রথের ভিতর স্থাপিত রহিয়াছে বিভিন্ন ধরনের বিগ্রহ। উহাদের মধ্যে ধর্মরাজ রথ, ভীম রথ ও দ্রৌপদী রথ অতি সুন্দর। পণ্ডিতগণ এই শিল্পকর্মকে দ্রাবিড় শিল্প-রীতির বিস্ময়কর অবদান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া মন্দিরগাত্রে মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে খোদিত চিত্রগুলি অপরূপ ভাস্কর্যের নিদর্শন।

মহাবলীপুরমের মন্দির—স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

চোলরাজগণের সামুদ্রিক পরাক্রম: চোলরাজ্য ভারতের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগে প্রতিদ্বন্দ্বী পল্লবগণকে পরাস্ত করিয়া চোল নৃপতি বিজয়ালয় (৮৬-৮৮০ খ্রীঃ) তাঞ্জোর অধিকার করেন। বস্তুতঃ সেই সময় হইতে চোলগণের প্রকৃত উত্থান পরিলক্ষিত হয়।

চোলগণের উত্থান

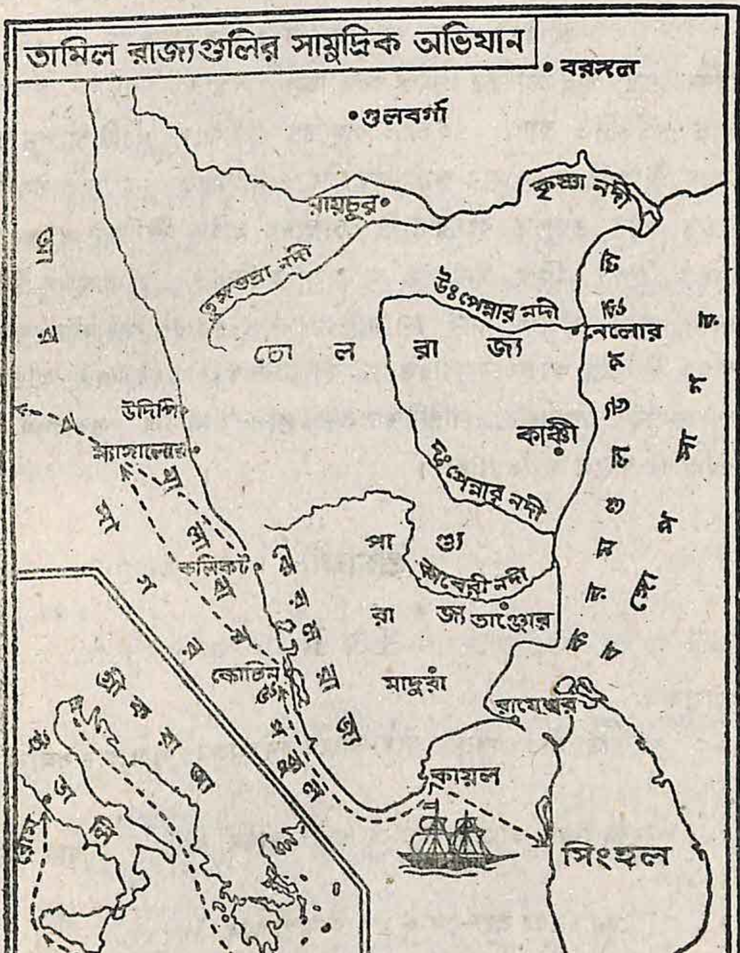
চোলগণের খুব উন্নত নৌবহর ছিল। এই বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন রাজরাজ। তাঁহার রাজত্বকালে লঙ্কা ও মালয় দ্বীপের বিরুদ্ধে চোল নৌবহর প্রেরিত হইয়াছিল।

উন্নত নৌবহর

যাহা হউক চোলগণের প্রতিদ্বন্দ্বী নৌ-শক্তি হিসাবে শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের নৌ-শক্তির কথা উল্লেখ করা চলে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম হইতে দশম শতাব্দী পর্যন্ত মালাক্কা প্রণালীতে শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের

শ্রীবিজয় সাম্রাজ্য

নৌ-শক্তির প্রাধান্য ছিল। এই সাম্রাজ্যের শক্তিকেন্দ্র ছিল সুমাত্রা উপদ্বীপে। সুমাত্রা ভিন্ন মালয় উপদ্বীপ ও জাভার পশ্চিমাংশসহ বেশ কতকগুলি দ্বীপ তখন শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।



দশম শতাব্দীর শেষাংশ অর্থাৎ প্রায় পাঁচশত বৎসরব্যাপী শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের সামুদ্রিক প্রতিপত্তি বজায় ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে চীনের সহিত

ভারতীয় বণিকগণের যে ব্যবসায়-বাণিজ্য চলিতেছিল তাহাতে শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের নৌবহর বিঘ্ন ঘটাইতেছিল। ফলে ১০০৭ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন চোলরাজ রাজেন্দ্র চোল ভারতীয় বণিকদের স্বার্থে এক বিশাল রণতরী সজ্জিত করিয়া শ্রীবিজয় শক্তির প্রাধান্য খর্ব করিতে উদ্যত হন। এই যুদ্ধে শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের নৌবহর পরাস্ত হইয়াছিল এবং মালয় উপদ্বীপে চোলগণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে সমুদ্রের পূর্বাঞ্চলে ঘাঁটি স্থাপন করিয়া চোলগণ শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে গিয়াও সামুদ্রিক যুদ্ধ চালাইয়াছিল। সেইহেতু প্রায় একশত বৎসরব্যাপী চোলদের সহিত শ্রীবিজয় শক্তির কলহ অব্যাহত ছিল। কিন্তু ক্রমাগত আক্রমণ হানিয়াও চোল রাজগণ শ্রীবিজয় সাম্রাজ্য ধ্বংস করিতে সমর্থ হন নাই। ফলে একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে চোলগণ শ্রীবিজয় অভিযান পরিত্যাগ করিয়াছিল। তবে এই অভিযানের ফলে মালাক্কা প্রণালীর সন্নিহিত কতকগুলি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান চোলদিগের দখলে আসিয়াছিল।

রাজেন্দ্র চোলের নৌ-অভিযান—কারণ

প্রশ্নাবলী

[ক]

রচনাত্মক ঃ

১। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের যুগে ভারতে হূন আক্রমণ ও তাহার ফলাফল বর্ণনা কর।

২। হর্ষবর্ধন উত্তর ভারতে কিভাবে রাজ্য স্থাপন করেন? তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

৩। হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক ঃ

(ক) হর্ষবর্ধনের সহিত গৌড়রাজ শশাঙ্কের সংঘর্ষ বর্ণনা কর। (খ) তোরমান কে ছিলেন? হূন আক্রমণের ফলাফল কি হইয়াছিল? (গ) দক্ষিণ ভারতের কোন্ রাজার সহিত হর্ষের যুদ্ধ হইয়াছিল? ঐ যুদ্ধের ফলাফল কি হইয়াছিল? (ঘ) হর্ষ-বর্ধনের রাজত্বকালে কোন্ বিখ্যাত পরিব্রাজক ভারতে আসিয়াছিলেন? সেই সময়

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা কিরূপ ছিল ? (৬) হর্ষবর্ধন কি সমগ্র উত্তর ভারত জয় করিয়াছিলেন ?

এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(১) 'সকলোত্তরপথনাথ' কাহার সম্পর্কে বলা হয় ? (২) হর্ষবর্ধনের রাজধানী কোথায় ছিল ? (৩) দ্বিতীয় পুলকেশী কোন্ রাজবংশের রাজা ছিলেন ? (৪) হূন আক্রমণের ফলে ভারতের কোন্ সাম্রাজ্যের পতন তরান্বিত হইয়াছিল ? (৫) হর্ষবর্ধনের সময় গৌড়রাজ কে ছিলেন ?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(১) ভারতে আগত হূনেরা — নামে পরিচিত ছিল ; (২) গুপ্তবংশের শেষ উল্লেখযোগ্য সম্রাট ছিলেন — ; (৩) হর্ষ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে কামরূপরাজ — সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন ; (৪) দ্বিতীয় পুলকেশীর সহিত যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে— নদীই দক্ষিণে হর্ষের রাজ্যসীমা হইয়াছিল ; (৫) চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী হর্ষবর্ধনকে — বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলেন ; (৬) হর্ষের রাজত্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘটনা — ভারত আগমন ; (৭) হিউয়েন সাঙের সম্মানার্থ হর্ষ কনৌজে — আহ্বান করিয়াছিলেন।

[খ]

রচনাত্মক ঃ

১। হর্ষোত্তর যুগে উত্তর ভারতের রাজপুত সামন্ত রাজ্যগুলি সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

২। "ত্রি-শক্তি সংগ্রাম" বলিতে কি বুঝ ? ঐ সংগ্রামে লিপ্ত প্রতিহার-বংশের উত্থান ও পতন বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক ঃ

(ক) কিভাবে রাজপুত জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল ? (খ) পৃথ্বীরাজ কে ছিলেন এবং কাহার সহিত যুদ্ধে তাঁহার পতন হইয়াছিল ? (গ) ত্রি-শক্তি সংগ্রামে কোন্ কোন্ শক্তি লিপ্ত হইয়াছিল এবং কি জন্য এই সংগ্রাম শুরু হইয়াছিল ?

এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(১) প্রতিহার-বংশের শ্রেষ্ঠ রাজার নাম কি ? (২) পৃথ্বীরাজ কোন্ বংশের রাজা ছিলেন ? (৩) কোন্ রাজবংশের রাজত্বকালে খাজুরাহের বিখ্যাত মন্দির নির্মিত হয় ? (৪) কোন্ স্থানের আধিপত্য লাভের জন্য ত্রি-শক্তি সংগ্রামের সূচনা হইয়াছিল ?

[গ]

রচনাত্মক ঃ

১। রাজা শশাঙ্ক কিভাবে উত্তর ভারতের রাজনীতিতে স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছিলেন।

২। পাল ও সেনবংশের রাজত্বকালে বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক ঃ

(ক) শশাঙ্ক কোন্ রাজ্যের রাজা ছিলেন? কিভাবে জীবন শুরু করিয়া তিনি রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন? (খ) বাংলার কোন্ কোন্ অঞ্চল লইয়া গৌড়বঙ্গ গঠিত হইয়াছিল? শশাঙ্কের ধর্মমত কি ছিল? (গ) শশাঙ্কের রাজ্যসীমা কতদূর বিস্তারলাভ করিয়াছিল? হর্ষবর্ধনের সহিত তাঁহার যুদ্ধের ফলাফল কি হইয়াছিল? (ঘ) পালবংশের রাজত্বকালে বাংলার ধর্মীয় অবস্থা কিরূপ ছিল? (ঙ) কিভাবে কৌলীন্য-প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল? (চ) সেন রজত্বকালে বাংলার ধর্মীয় ক্ষেত্রে কি কি পরিবর্তন হইয়াছিল? (ছ) পাল ও সেনবংশের রাজত্বকালে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে কি জান?

এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(১) বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজার নাম কি? (২) কর্ণসুবর্ণ কোথায় অবস্থিত? (৩) শশাঙ্ক কোন্ ধর্মের অনুরাগী ছিলেন? (৪) কোন্ যুগে রামাবতী শহরের উল্লেখ পাওয়া যায়? (৫) বাংলার কোন্ রাজবংশের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্যধর্মের উত্থান হইয়াছিল? কোন্ রাজা কৌলীন্য-প্রথা প্রবর্তন করিয়াছিলেন? (৭) বিক্রমশীলা বিহার কোথায় অবস্থিত? (৮) কোন্ রাজবংশের রাজত্বকালে ওদন্তপুরী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(১) প্রথম জীবনে শশাঙ্ক সম্ভবতঃ গুপ্তরাজ — সামন্ত ছিলেন; (২) বাংলার রাজগণের মধ্যে — ছিলেন প্রথম স্বাধীন রাজা; (৩) শশাঙ্ক ছিলেন — উপাসক; (৪) পাল ও সেনযুগে সমাজে নারীর স্থান — ছিল; (৫) রামপাল প্রতিষ্ঠিত রাজধানীর নাম হইল — নগরী; (৬) পাল রাজগণ — ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন।

[ঘ]

রচনাত্মক ঃ

১। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজ্য জয় ও কৃতিত্ব বর্ণনা কর।

২। পল্লবদের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৩। দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বিকাশে চালুক্য ও পল্লব রাজগণের অবদান আলোচনা কর।

৪। চোলদের নৌ-শক্তির পরিচয় দাও।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন:

(ক) চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতির নাম কি? তিনি কোন্ কোন্ রাজ্যের বিরুদ্ধে বিজয়াভিযান করিয়াছিলেন? (খ) কিভাবে বাতাপীর চালুক্য বংশের উত্থান হইয়াছিল? চালুক্যগণ কোন্ ধর্মের অনুরাগী ছিলেন? (গ) পল্লববংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতির নাম কি? তাঁহার দিগ্বিজয় ও কৃতিত্ব বর্ণনা কর। (ঘ) বহির্ভারতের কোন্ সাম্রাজ্যের সহিত চোলদের নৌযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল? ইহার ফলাফল কি হইয়াছিল? (ঙ) শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের শক্তিকেন্দ্র কোথায় অবস্থিত ছিল? চোলদের সহিত তাহাদের সংঘর্ষের কারণ কি ছিল?

এক কথায় উত্তর দাও:

(১) চালুক্যবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম কি? (২) কোন্ চৈনিক পরিব্রাজক চালুক্য রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন? (৩) পল্লবদের শ্রেষ্ঠ নৃপতি কে ছিলেন? তিনি কি জন্য বিখ্যাত? (৪) কোন্ চোলরাজের রাজত্বকালে শ্রীবিজয় সাম্রাজ্য অভিযানের সূচনা হইয়াছিল?

শূন্যস্থান পূরণ কর:

(১) চালুক্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন —; (২) দ্বিতীয় পুলকেশীর সহিত পারস্যরাজ — পত্রালাপ চলিত; (৩) চালুক্যরাজ — 'সত্যাশ্রয়ী', 'শ্রীপৃথিবী বল্লভ' প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন; (৪) — শতাব্দীতে পল্লবগণ দাক্ষিণাত্যে একটি পরাক্রান্ত শক্তিতে পরিণত হয়; (৫) পল্লবরাজগণের মধ্যে — ছিলেন শ্রেষ্ঠ নৃপতি।

দ্বাদশ অধ্যায়

ভারতের সহিত বিদেশের সম্পর্ক

সূচনা ঃ কুষাণ যুগ হইতে বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারকগণ বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের সূত্র ধরিয়া মধ্য এশিয়ার নানাস্থানে যাতায়াত শুরু করিয়াছিল।

মহাযান মতবাদ মধ্য এশিয়ায় মঠ প্রতিষ্ঠা

কুষাণরাজ কণিষ্কের সময় বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রে মহাযান মতবাদ প্রাধান্য পাইয়াছিল। তাই এই সকল ধর্মপ্রচারকগণ ছিলেন মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রচারক। মধ্য এশিয়ার স্থানীয় বণিক ও শাসকগণ সেই সময় বৌদ্ধধর্মের ভাবধারায় সহজেই আকৃষ্ট হন। এই কারণে মধ্য এশিয়ায় তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মরূদ্যান ও ব্যবসায়কেন্দ্রগুলিতে কতিপয় মঠ নির্মিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া তাহারা ভারতীয় লিপিও গ্রহণ করিয়াছিল। এইভাবে কাস্পিয়ান সাগর হইতে চীনের দ্বারদেশ পর্যন্ত সুবিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

মধ্য এশিয়ায় প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার

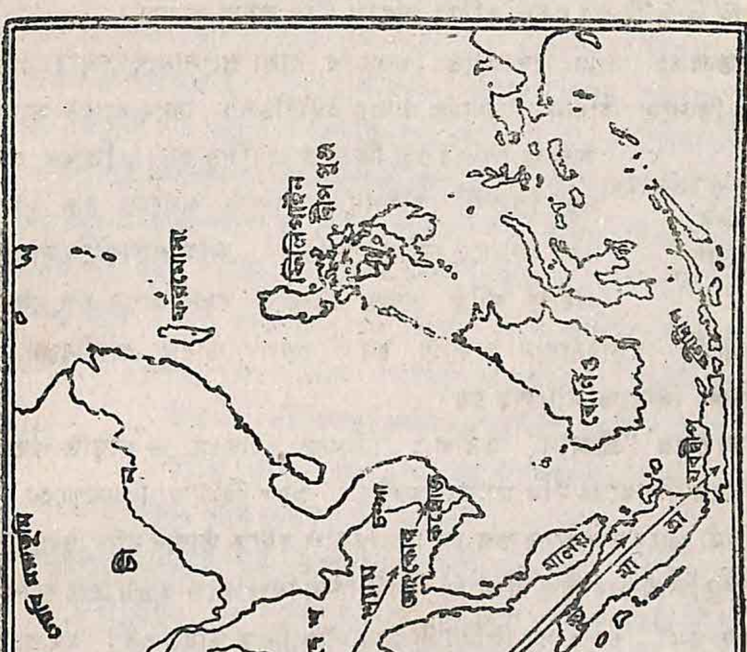
সুবিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক সার অরেল স্টাইন মধ্য এশিয়ার তুর্কিস্তানে অনুসন্ধান করিয়া নানা স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। তিনি খোটান হইতে শুরু করিয়া তাকলা-মাকান মরুভূমির মধ্য দিয়া চীন দেশের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত অনুসন্ধান চালান এবং অনেক প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ খনন করিয়া প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করেন। এইভাবে মধ্য এশিয়ার খোটান, কুচা, তুরফান্ প্রভৃতি অঞ্চলে বহু বৌদ্ধ বিহার, হিন্দু ও বৌদ্ধ মূর্তি এবং সংস্কৃত ও প্রাকৃত অক্ষরে লেখা পুঁথিপত্র প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

হিউয়েন সাঙের বিবরণী

হিউয়েন সাঙের বিবরণীতেও মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসারের উল্লেখ আছে। কারণ তিনি মধ্য এশিয়ার পথেই ভারতে আসিয়াছিলেন এবং ঐ পথ ধরিয়াই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

মধ্য এশিয়ার পথ ধরিয়াই বৌদ্ধধর্ম চীনে বিস্তারলাভ করিয়াছিল।

ভারত হইতে অনেক ধর্ম-প্রচারক চীনে গমন করিয়া সেখানে বৌদ্ধধর্ম প্রচার



করেন। ৩৭৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনে বৌদ্ধধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা লাভ করে। অতঃপর চীন হইতে বৌদ্ধ তীর্থস্থান দর্শনের জন্য ফা-হিয়েন, সুঙ-য়ুন, হিউয়েন সাঙ এবং ই-সিঙ ভারতে আসিয়াছিলেন।

চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রসার

অবশ্য তাঁহাদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল ভারত হইতে মূল বৌদ্ধ শাস্ত্রাদি ও পুঁথিপত্র নকল করিয়া সেগুলি চীনে লইয়া যাওয়া।

তিব্বতঃ সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বতের রাজা স্রং-সান-গাম্পোর রাজত্বকালে তিব্বতে মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রসার হইয়াছিল। ক্রমে সংস্কৃত ভাষা ও অন্যান্য লিপির চর্চা তিব্বতে প্রবর্তিত হয়। তিব্বত হইতে বহু শিক্ষার্থী বৌদ্ধশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে আসিত। অষ্টম শতাব্দীতে নালন্দার অধ্যক্ষ শান্তি রক্ষিত তিব্বতে গমন করেন এবং সেখানে বৌদ্ধধর্মের সংস্কারসাধনে উদ্যোগী হন। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম রূপ 'চর্যাপদ' তিব্বতে আবিষ্কৃত হয়।

ভারত ও তিব্বতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ

দ৷পঙ্কর "শ্রীজ্ঞান" অতীশ ঃ তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারের ইতিহাসে দীপঙ্করের নাম আজিও স্মরণীয়। ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে দীপঙ্করের জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতে তাঁহার বুদ্ধি ছিল প্রখর। ওদন্তপুরের আচার্য শীল রক্ষিতের নিকট তিনি শিক্ষালাভ করেন এবং বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। ইহার পর তিনি "শ্রীজ্ঞান" উপাধিতে ভূষিত হন। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে দীপঙ্কর ব্রহ্মদেশ ও সুবর্ণদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি বিক্রমশীলার প্রধান আচার্যপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই পালরাজ নয়পালের অনুরোধে দীপঙ্কর সশিষ্য তিব্বত গমনের জন্য প্রস্তুত হন। কারণ এই সময় তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল এবং তিব্বতরাজ পালরাজকে কয়েকজন বৌদ্ধ আচার্য প্রেরণের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন।



দীপঙ্কর "শ্রীজ্ঞান" অতীশ

ফলে বৃদ্ধ দীপঙ্কর কয়েকজন শিষ্যের সহিত দুর্গম নেপালের পথে তিব্বত যাত্রা করেন। সেখানে তিনি বৌদ্ধধর্মের সংস্কার-সাধন করেন এবং তিব্বতীয় ভাষায় বহু সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থ অনুবাদ করেন। তিব্বতবাসিগণ তাঁহাকে অতীশ (শ্রেষ্ঠ) উপাধি দান করে। দীপঙ্কর তিব্বতেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ঃ ব্রহ্মদেশসহ চম্পা, মালয়, সুমাত্রা, জাভা, বলী, বোর্ণিও প্রভৃতি ভারতের পূর্বে অবস্থিত স্থানগুলিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া নামে অভিহিত করা হয়। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক হইতে ভারতীয় নামধারী রাজাগণ ঐ সকল দেশে রাজত্ব করিতেন। ঐ সকল দেশে বাণিজ্য-যাত্রা সম্পর্কে বৌদ্ধজাতকে অনেক গল্প আছে। দেশগুলি ছিল খুবই সমৃদ্ধশালী এবং

স্বর্ণভূমি

ভারতীয় বণিকগণ জলপথে বাণিজ্য করিতে গিয়া সেখান হইতে প্রভূত ধনরত্নসহ দেশে ফিরিত। সেই কারণে ঐ দেশগুলির 'সুবর্ণভূমি' নাম দেওয়া হইয়াছিল।

গুপ্তযুগে ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে বহুসংখ্যক সামুদ্রিক বন্দরের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ সকল বন্দরের সাহায্যে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপগুলির

গুপ্তযুগ

সহিত সমুদ্রপথে ভারতীয় বণিকদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ক্রমে বাণিজ্যের সূত্র ধরিয়া ভারতীয় সংস্কৃতি ঐ সকল দেশে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। ব্রহ্মের মধ্য দিয়া স্থলপথেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতবাসীর যাতায়াত ছিল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আনাম (ভিয়েৎনাম) অঞ্চলের প্রায় সমস্তটি লইয়া চম্পা রাজ্য গঠিত ছিল। বর্তমানে চম্পা নামে কোন দেশ নাই। কথিত

চম্পা

আছে যে, বাংলার চম্পা (বর্তমান বিহারের ভাগলপুর) হইতে একদল বণিক আনাম অঞ্চলে গমন করে এবং মাতৃভূমির নামে নূতন উপনিবেশের নাম দিয়াছিল চম্পা। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে এখানে হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত হয় ও হিন্দু সভ্যতা বিস্তারলাভ করে। চম্পায় অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

কম্বোজ ঃ কম্বোডিয়ার (বর্তমান কাম্পুচিয়া) উত্তর-পূর্ব কোণে কম্বোজ নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপিত হয়। ক্রমশ এই রাজ্য শক্তিশালী হইয়া পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ অধিকার করে। কোন এক সময় সমগ্র কম্বোডিয়া,

কোচিন চীন, লাওস, ব্রহ্মদেশ ও মালয় উপদ্বীপের কতক অংশ এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আঙ্কোরভাটের সুপ্রসিদ্ধ মন্দির এই রাজ্যের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ষষ্ঠ শতাব্দীতে কম্বোজের যথার্থ গৌরবময় যুগ আরম্ভ হয়।

প্রাচীন কম্বোজের রাজধানী বহুবার স্থানান্তরিত হইয়াছিল। সেই সব রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ এখনও উত্তর কম্বোজের নানাস্থানে দেখা যায়। নবম শতকের শেষভাগে যশোধরপুরে রাজধানী স্থাপিত হয়। এই রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ বর্তমানে অঙ্কোরথম্।

যশোধরপুরের চারিধার ছিল সুপ্রশস্ত ও গভীর পরিখা দিয়া ঘেরা। সেতু দিয়া পরিখা পার হইয়াই নগরের বিশাল প্রাচীর অবস্থিত ছিল। এই প্রাচীর প্রায় নয় মাইল ধরিয়া চতুষ্কোণ যশোধরপুরকে বেষ্টন করিয়াছিল। প্রবেশ করিবার পাঁচটি তোরণ বা দরজা একইরূপে নির্মিত ছিল। প্রত্যেকটির উপরে ছিল পাথরের খোদিত বিশাল চতুর্মুখ মূর্তি। কেহ বলে ব্রহ্মার, কেহ বলে শিবের মূর্তি। চতুর্মুখের মাথায় মুকুট আর নাই, উহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

যশোধরপুর



আঙ্কোরভাটের মন্দির

রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বায়ন মন্দিরটি তিনটি স্তর-বিন্যাসে নির্মিত। সর্বোচ্চ স্তরের উপর মুকুটের মত মন্দিরের উচ্চ চূড়া। মন্দিরের দেওয়ালগাত্রে খোদিত চিত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব

বায়ন মন্দির

প্রভৃতি দেবতার কীর্তিকলাপ, সাগরমন্থন প্রভৃতি হিন্দুধর্মের পুরাণকথার চিত্রগুলি পাথরের উপর সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এগুলি দেখিলে বিস্ময়ে মুগ্ধ হইতে হয়।

রাজধানীর অনতিদূরে কম্বোজের সবচেয়ে বড় কীর্তি আঙ্কোরভাট অবস্থিত। বিরাট পাথরের মন্দিরটি নানা স্তরে বিভক্ত। ইহার প্রাচীর-গাত্রে নটরাজ ও কিরাতবেশী শিব এবং অর্জুনের যুদ্ধদৃশ্য প্রভৃতি রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের ধর্ম-কাহিনী ভাস্করের সুনিপুণ হস্তে পাথরের গায়ে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আঙ্কোরভাট

শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য—(মালয়, জাভা): মালয় উপদ্বীপের উপকূলে অষ্টম শতকে শৈলেন্দ্রবংশ এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করে এবং ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ দ্বীপপুঞ্জে ইহার আধিপত্য ছড়াইয়া পড়ে। সুমাত্রা, জাভা (যবদ্বীপ), বলী ও বোর্ণিও দ্বীপ এবং মালয় উপদ্বীপ এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যে-সকল আরব বণিক এই সকল স্থানে বাণিজ্য করিতে আসিতেন, তাঁহারা শৈলেন্দ্র রাজাদের শক্তি, ঐশ্বর্য ও জাঁকজমকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। একজন আরব লেখক লিখিয়াছেন যে, শৈলেন্দ্ররাজকে মহারাজ অর্থাৎ রাজার রাজা বলা হইত। ভারত ও চীনের রাজারা মহারাজকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। তাঁহার দৈনিক রাজস্বের আয় ছিল দুইশত মণ স্বর্ণ। কোন রাজাই তাঁহার অপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্যশালী বা শক্তিশালী ছিলেন না। মহারাজ প্রতিদিন একটি সোনার ইট একটি হ্রদে জলদেবতাকে উৎসর্গ করিতেন।

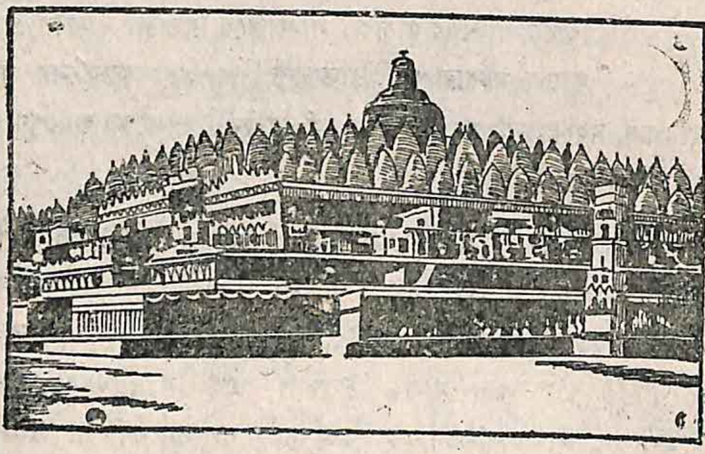
ঐশ্বর্য ও জাঁকজমক

শৈলেন্দ্র রাজারা ছিলেন মহাযান বৌদ্ধ। বাংলাদেশের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। শৈলেন্দ্ররাজ বালপুত্রদেব বাংলার সম্রাট দেবপালের নিকট একজন দূত পাঠাইয়াছিলেন। তিনি নালন্দায় একটি বৌদ্ধ সংঘারাম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই রাজার অনুরোধে দেবপাল গয়া ও পাটনা জেলার পাঁচখানি গ্রাম নালন্দার বৌদ্ধ সংঘারামকে দান করেন। কুমার ঘোষ নামে বাংলার এক বৌদ্ধ ভিক্ষু শৈলেন্দ্র রাজাদের গুরু ছিলেন।

বাংলাদেশের সহিত সম্পর্ক

বরোবুদুরের মন্দির

শৈলেন্দ্র রাজবংশের রাজত্বকালে যবদ্বীপে বরোবুদুর নামক স্থানে এক সুবিখ্যাত বৌদ্ধ মঠ নির্মিত হয়। এই বিশাল মঠ একটি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। মঠের গায়ে বুদ্ধদেবের সমস্ত জীবনকাহিনীর বিবিধ চিত্র পাথরের উপর খোদিত রহিয়াছে। এই মন্দিরে



বরোবুদুরের মন্দির

পর পর সাজান নয়টি স্তর বুদ্ধদেবের মূর্তি দ্বারা পরিশোভিত এবং ইহা অষ্টম আশ্চর্যরূপে অভিহিত হইয়া থাকে। এই বৌদ্ধ মঠের নিকটে শত শত হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। যবদ্বীপে রামায়ণ ও মহাভারত খুবই জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক ঃ

১। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার বিস্তৃতি সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

২। শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য কোথায় অবস্থিত ছিল? শৈলেন্দ্র রাজাদের কৃতিত্ব বর্ণনা কর।

৩। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম কিভাবে বিস্তৃত হয়?

৪ আঙ্কোরভাট ও অঙ্কোরথম্ সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক :

(ক) মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধধর্মের প্রসার কিভাবে জানিতে পারা যায়? (খ) দীপঙ্কর কি উদ্দেশ্যে তিব্বতে গিয়াছিলেন? (গ) সুবর্ণভূমি বলিতে কি বুঝায়? (ঘ) অঙ্কোরথম্-এর ধ্বংসাবশেষ কাহাকে বলে? (ঙ) আঙ্কোরভাট কি এবং কোথায় অবস্থিত? (চ) কোন্ রাজবংশের রাজত্বকালে বরোবুদুরের মন্দির নির্মিত হইয়াছিল? কিভাবে চম্পা রাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল?

এক কথায় উত্তর দাও :

(১) বর্তমানকালের কোন্ রাজ্য লইয়া চম্পা রাজ্য গঠিত ছিল? (২) যশোধরপুর কোন্ রাজ্যের রাজধানী ছিল? (৩) কম্বোজের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি কি? (৪) শৈলেন্দ্র রাজগণ কোন্ ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন? (৫) বরোবুদুর কোন্ রাজবংশের স্থাপত্য কীর্তি?

শূন্যস্থান পূরণ কর :

(১) বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক — মধ্য-এশিয়ার মরু অঞ্চলে বহু বৌদ্ধস্তূপ আবিষ্কার করেন; (২) নবম শতাব্দীর শেষভাগে — কম্বোজের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়; (৩) কম্বোজের রাজধানীর কেন্দ্রমূলে অবস্থিত — মন্দির এবং ইহার অনতিদূরে কম্বোজের সবচেয়ে বড় কীর্তি — অবস্থিত; (৪) শৈলেন্দ্ররাজ — সম্রাট দেবপালের নিকট একজন দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন; (৫) শৈলেন্দ্র রাজবংশের রাজত্বকালে যবদ্বীপে — নামক স্থানে একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মঠ নির্মিত হয়।

———

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সুলতানী আমল

সূচনা ঃ ভারতে মুসলমান শাসনের প্রথম পর্বে, ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত, পাঁচটি রাজবংশের তুর্ক-আফগান সুলতানগণ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই শাসনকালকে বলে সুলতানী আমল।

ভারতে তুর্কীদের আগমনের সূচনা হইয়াছিল আফগানিস্তানে গজনী রাজ্যের উত্থানের পর (৯৬৩ খ্রীঃ)। কথিত আছে যে, গজনীর সুলতান মাহ্‌মুদ সতের বার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন।

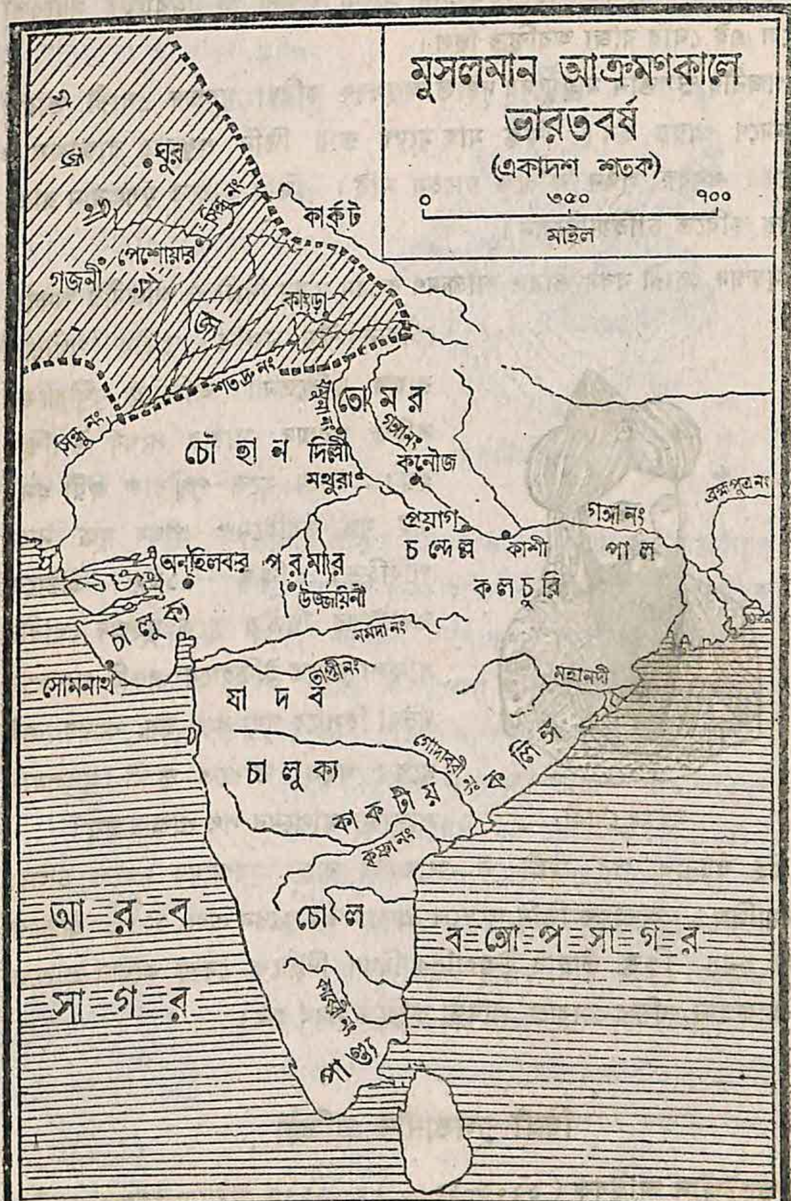
গজনীর উত্থান
স্থলতান মাহ্‌মুদ

ভারতের ধনরত্ন লুণ্ঠন এবং বিজয়ী বীরের খ্যাতি অর্জনই তাঁহার মূল লক্ষ্য ছিল। তাঁহার আক্রমণকালে উত্তর ভারত কতিপয় খণ্ড ও ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তাহাদের মধ্যে কোন ঐক্য ছিল না। সেই কারণে সুলতান মাহ্‌মুদের পক্ষে ঐ সকল রাজ্যের রাজগণকে একে একে পরাস্ত করা সহজ হইয়াছিল। কিন্তু মাহ্‌মুদ ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের কোন চেষ্টা করেন নাই।



স্থলতান মাহ্‌মুদ

তুর্কী আক্রমণের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা করেন মুহম্মদ ঘোরী। মুহম্মদ


মুসলমান আক্রমণকালে
ভারতবর্ষ
(একাদশ শতক)
০ ৩৫০ ৭০০
মাইল
ঘুর
পেশোয়ার
গজনী
কার্কট
কাংড়া
শতদ্রু নং
সিন্ধু নং
তোমর
চৌহান
দিল্লী
মথুরা
কনৌজ
প্রয়াগ
চন্দেল্ল
কাশী
গঙ্গা নং
পাল
ব্রহ্মপুত্র নং
অনহিলবর
পরমার
উজ্জয়িনী
কলচুরি
চালুক্য
নর্মদা নং
তাপ্তী নং
সোমনাথ
যাদব
মহানদী
চালুক্য
গোদাবরী নং
কাকতীয়
কৃষ্ণা নং
চোল
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
পাণ্ড্য

ঘোরী ছিলেন ঘোররাজ গিয়াসউদ্দীনের ভ্রাতা, গজনী ও হিরাটের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এই ঘোর রাজ্য অবস্থিত ছিল।

গজনীর সুলতান মাহ্‌মুদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া মুহম্মদ ঘোরী ভারত আক্রমণে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু মাহ্‌মুদের ন্যায় তিনি শুধুমাত্র রাজ্যজয় ও ভারতের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিতে চাহেন নাই। তিনি ভারতে মুসলমান রাজ্য বিস্তার করিতে চাহিয়াছিলেন।

মুহম্মদ ঘোরী যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন দিল্লী ও আজমীর অঞ্চলে চৌহানবংশীয় নৃপতি তৃতীয় পৃথ্বীরাজ রাজত্ব করিতেন। অচিরেই পৃথ্বীরাজের সহিত মুহম্মদ ঘোরীর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। প্রথম যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ জয়ী হন। এই যুদ্ধ তরাইনের প্রথম যুদ্ধ নামে পরিচিত। কিন্তু ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে মুহম্মদ ঘোরীর সাফল্য ভারত-ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে গণ্য করা হয়, কারণ এই যুদ্ধের ফলে ভারতে স্থায়ী মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ প্রস্তুত হয়।


মুহম্মদ ঘোরী

এই ঘটনার পর দিল্লী ও আজমীর রাজ্য মুহম্মদের দখলে চলিয়া আসিয়াছিল। অতঃপর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে নিহত হন। কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ দিল্লীকে কেন্দ্র করিয়া ভারতে তুর্ক-আফগান শক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন।

দিল্লী সুলতানীর প্রতিষ্ঠা

কুতবউদ্দীন আইবক (১২০৬-১২১০): ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ ঘোরীর মৃত্যু হইলে তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর ও সেনাপতি কুতবউদ্দীন আইবক দিল্লীর প্রথম স্বাধীন সুলতান-পদে অভিষিক্ত হন।

কুতবউদ্দীন যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন তাহার নাম "দাসবংশ" ; কারণ এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও অপর দুইজন স্থলতান প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন।



কুতবউদ্দীন আইবক

১২১০ খ্রীষ্টাব্দে কুতবউদ্দীনের মৃত্যু হয়। তাঁহার পরবর্তী দাসবংশের স্থলতানদিগের মধ্যে ইলতুৎমিস, রাজিয়া ও বলবনের রাজত্বকাল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইলতুৎমিসই (১২১১—১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন দিল্লী স্থলতানীর প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রথমেই তিনি আমীরদের বিদ্রোহ দমন করেন এবং দিল্লী রাজ্যের বিভিন্ন অংশ ও তৎসহ বদায়ুন, অযোধ্যা, বারাণসী, শিবালিক প্রভৃতি স্থানে শান্তি ও শৃংখলা স্থাপন করেন। অতঃপর তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের দমন করেন। তিনি বাংলার বিদ্রোহ দমন করেন।

ইলতুৎমিস

ক্রমে সিন্ধুদেশ ও বাংলা তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ইলতুৎমিস রনথম্ভোর ও গোয়ালিয়র পুনরধিকার করেন এবং মালবদেশ আক্রমণ করিয়া উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দির ধ্বংস করেন।

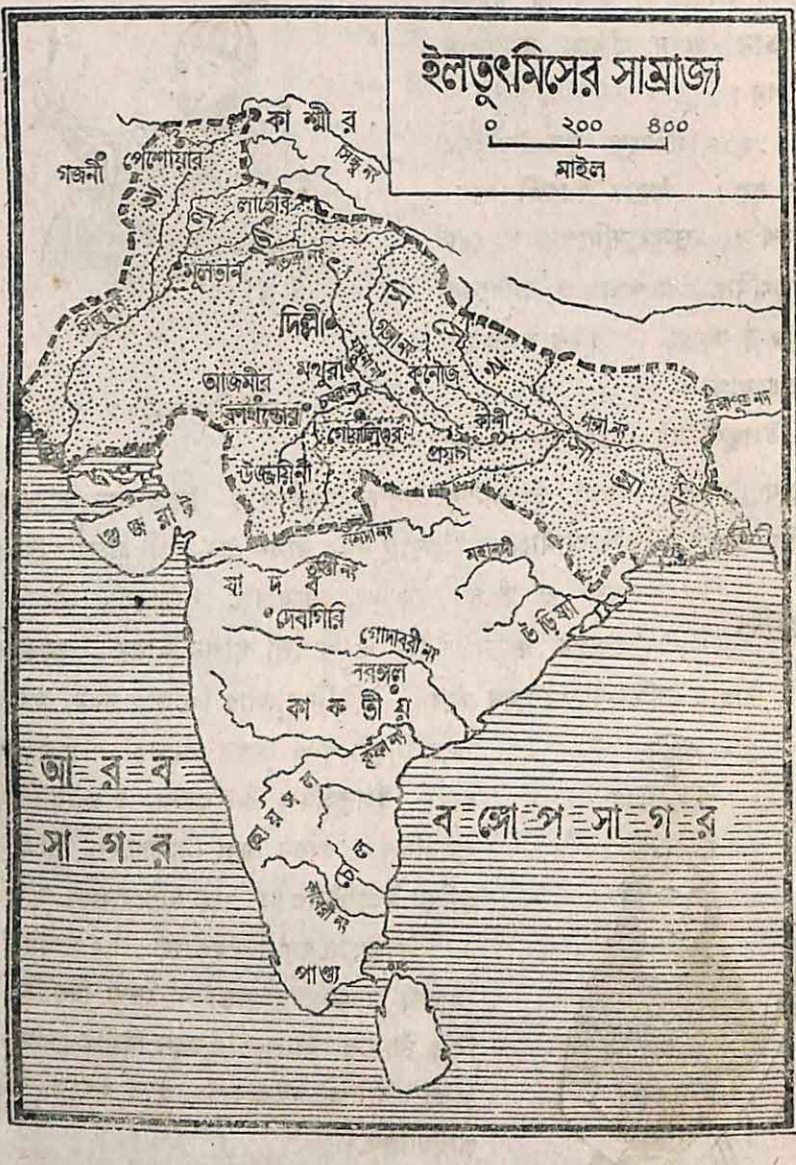


স্থলতানা রাজিয়া

ইলতুৎমিসের রাজত্বকালে ১২২১ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গল আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার বিচক্ষণতার ফলে দিল্লীর স্থলতানী রাজ্য মোঙ্গল আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।

ইলতুৎমিসের মৃত্যুর (১২৩৬ খ্রীঃ) পর তুর্কী আমীরগণ পুত্র রুকনুদ্দিনকে সিংহাসনে বসান। কিন্তু ইলতুৎমিস স্বয়ং তাঁহার কন্যা

রাজিয়াকে উত্তরাধিকারিণী মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন। ফলে অচিরেই



রুকনুদ্দিনকে সরাইয়া রাজিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার যথেষ্ট শাসনযোগ্যতা ছিল এবং অন্যান্য পুরুষোচিত গুণাবলীরও অভাব ছিল না। কিন্তু তুর্কী আমীরগণ একজন

রাজিয়া

স্ত্রীলোকের শাসন পছন্দ করিতেন না, ফলে অচিরেই রাজিয়ার পদচ্যুতি ও মৃত্যু ঘটে।

রাজিয়ার পরবর্তী দাসবংশের সুলতানদিগের মধ্যে বলবনই ছিলেন একমাত্র কীর্তিমান সুলতান। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি রাজ্যে শৃংখলা আনয়নের উদ্দেশ্যে প্রথমেই মেওয়াটী জলদস্যুদের দমন করেন, সৈন্যবাহিনীর দক্ষতা বৃদ্ধি করিতেও তিনি উদ্যোগী হইয়াছিলেন। জায়গীরদার প্রথার অবসান ঘটাইয়া তিনি নগদ বেতন প্রথা চালু করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি তুর্কী আমীরগণের ঔদ্ধত্য দমন করিয়া দিল্লী সুলতানীর মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। বলবনের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গল-আক্রমণের সূচনা হইয়াছিল। বলবন ঐ আক্রমণ প্রতিহত করিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন।

বলবন

খলজীবংশ ঃ দাসবংশের পতনের পর খলজীবংশ (১২৯১-১৩১৬ খ্রীঃ) দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করে। খলজী-বংশের দ্বিতীয় সুলতান আলাউদ্দিন খলজী (১২৯৬-১৩১৬ খ্রীঃ) ছিলেন একজন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী শাসক।

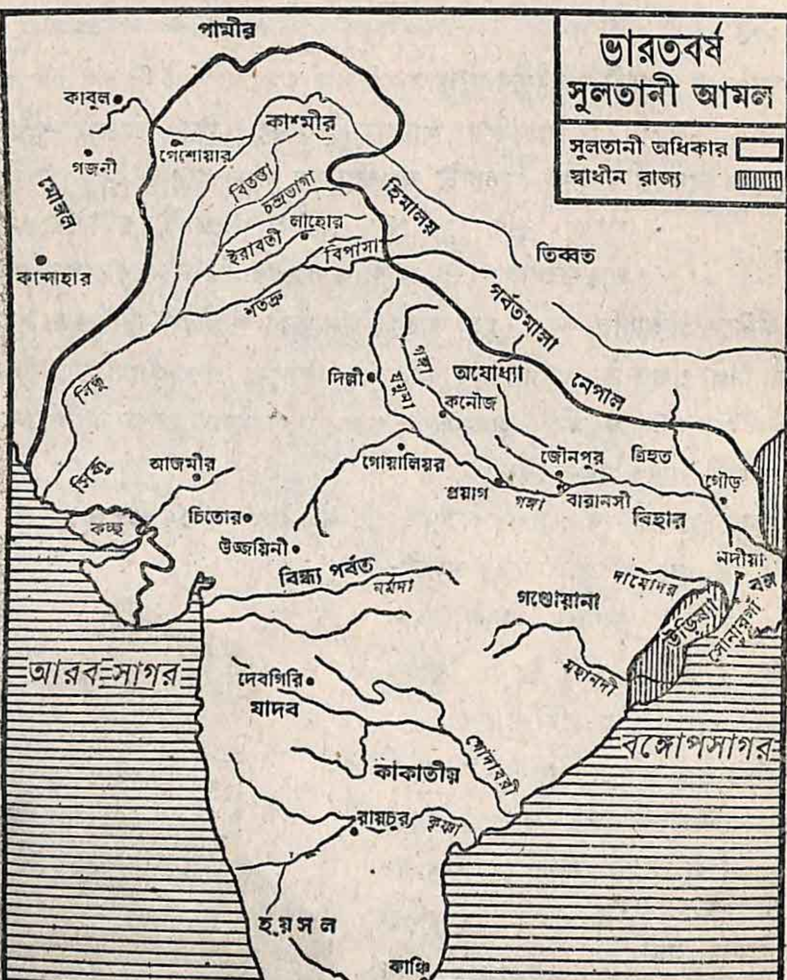

আলাউদ্দিন খলজী

সিংহাসনে আরোহণের পূর্বেই আলা-উদ্দিন দক্ষিণ ভারতের দেবগিরি রাজ্য আক্রমণে সফল হইয়াছিলেন। অতঃপর সিংহাসন লাভ করিয়া প্রথমেই তিনি রাজ্যজয়ে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। প্রথমেই তিনি রাজপুতানার বিভিন্ন রাজ্য জয় করিতে উদ্যোগী হন। ফলে গুজরাট, মেবার, চান্দেরী, উজ্জয়িনী, মালব প্রভৃতি রাজ্য তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

আলাউদ্দীন খলজী

আলাউদ্দিন দাক্ষিণাত্যেও সামরিক অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। বস্তুত দাক্ষিণাত্যে তাঁহার সৈন্যবাহিনীর সাফল্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ ইহার ফলে প্রায় সমগ্র ভারতে সুলতানী সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়।

আলাউদ্দিনের সময় বার বার মোঙ্গল-আক্রমণ সংঘটিত হয়। ইহা



প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে আলাউদ্দিন শেষ পর্যন্ত সীমান্ত অঞ্চলে দুর্গ নির্মাণ ও পাঞ্জাবে সৈন্য মোতায়েনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

তুঘলকবংশ ঃ খলজীবংশের পতনের পর তুঘলকবংশের রাজত্বের সূচনা হইয়াছিল। এই বংশের সুলতানগণের মধ্যে মহম্মদ-বিন্-তুঘলক ও ফিরুজ-শাহের নাম বিশেষত উল্লেখযোগ্য।

মহম্মদ-বিন্-তুঘলক ঃ মহম্মদ-বিন্-তুঘলক ছিলেন এক বিচিত্র স্বভাবের মানুষ। তিনি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সমরনিপুণ সেনাপতি ছিলেন। তিনি মদ্যপান করিতেন না এবং সংযত জীবন যাপন করিতেন। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় নিরলসভাবে তিনি ইসলামের অনুশাসন মানিয়া চলিতেন। তিনি রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত নানাবিধ নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতেন এবং সেগুলি কার্যে পরিণত করিতে গিয়া এমন সব কাণ্ড করিয়া ফেলিতেন যে, অনেকে তাঁহাকে 'পাগল' পর্যন্ত বলিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাঁহার কার্যাবলীকে ঠিক খামখেয়ালী বা পাগলামি বলা চলে না। তিনি যে-সকল পরিবর্তন করিতে গিয়াছিলেন, সেকালের লোকে তাহা পছন্দ করিত না। তাঁহার ধৈর্যেরও অভাব ছিল; কাজেই প্রজার ভাল করিতে গিয়া বাধা পাইয়া সুলতান শেষে প্রজাপীড়ক হইয়া উঠিয়াছিলেন।

পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিগত জীবন

অসাফল্যের কারণ



মহম্মদ-বিন্-তুঘলক

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মহম্মদ প্রথমেই গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলের রাজস্ব বৃদ্ধি করিলেন। ফলে কৃষকগণ চাষ-আবাদ প্রায় ছাড়িয়া দিয়া বনে-জঙ্গলে গিয়া আশ্রয় লইল। চাষ-আবাদ কমিয়া যাওয়ায় রাজস্বে ঘাটতি পড়িয়া গেল; কারণ যতখানি জমি চাষ হইত বৎসর বৎসর তাহারই উপর খাজনা ধরা হইত। মহম্মদ ভাবিলেন, প্রজারা বিদ্রোহী হইয়াছে। সুতরাং তিনি সৈন্য পাঠাইয়া অসহায় কৃষকদিগকে হত্যা করিলেন। পরে প্রজাদের দুর্দশামোচনের উদ্দেশ্যে সুলতান স্বয়ং ঋণদানের আদেশ দিয়াছিলেন।

দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি

দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহ হইতে মহম্মদের মনে ধারণা হইয়াছিল যে, সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে রাজধানী স্থাপন করিলে রাজ্যশাসনের সুবিধা হইবে।

রাজধানী পরিবর্তন

মহম্মদের রাজ্য উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে দ্বারসমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দিল্লী নগরী এই বিশাল রাজ্যের এক প্রান্তে, কিন্তু দেবগিরি (বা দৌলতাবাদ) রাজ্যের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত। তাহা ছাড়া দেবগিরিতে রাজধানী হইলে মোঙ্গলদিগের আক্রমণ হইতে অনেকখানি দূরে থাকা যায়, সুতরাং সুলতান দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করিতে সংকল্প করিলেন (১৩২৭ খ্রীঃ); তৎক্ষণাৎ আদেশ জারী করা হইল যে, দিল্লীর সকল লোককে এক নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে দেবগিরি যাইতে হইবে। যে না যাইবে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। দেবগিরি দিল্লী হইতে প্রায় ৭০০ মাইল দূরে। সেকালে রাস্তা ও যানবাহনের সুবিধা ছিল না। পথে বহু লোক প্রাণ হারাইল। কিছুকাল পরে সুলতানের মত বদলাইয়া গেল। আবার তিনি সকলকে দিল্লী ফিরিতে আদেশ দিলেন। কেবলমাত্র সরকারী দপ্তর স্থানান্তরিত করিয়াই যে রাজধানী স্থানান্তর করা সম্ভব ছিল তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই।

মহম্মদ অর্থের অভাব পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে একটি নূতন উপায় অবলম্বন করেন। আজকাল আমাদের দেশে যেমন কাগজের নোট চলে, সেকালে চীনদেশে সেইরূপ নোট চলিত। সুলতান স্বীয় রাজ্যে এইরূপ তামার নোট চালাইবার ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু উহা যাহাতে জাল না হয়, তাহার কোন ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। প্রজারা অবাধে নোট জাল করিয়া খাজনা দিতে লাগিল। শেষে তামার নোটের আর কোন মূল্য রহিল না। উপরন্তু বিদেশী বণিকেরা এই নোট লইতে রাজী হইলেন না। ব্যবসায়-বাণিজ্য অচল হইল। তখন সুলতান তামার নোট ফিরাইয়া লইয়া সোনা-রূপার পরিবর্তে উহার মূল্য মিটাইয়া দিলেন। ফলে রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল।

তামার নোট প্রচলন

একবার সুলতানের খেয়াল হইল, খোরাসান ও ইরাক জয় করিবেন। এইজন্য বহু সৈন্য সংগ্রহ করা হইল, কিন্তু অর্থের অভাবে তাঁহাকে শেষে এই

সংকল্প ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। অতঃপর তিনি হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত কারাচলের হিন্দুরাজ্য জয় করিবার জন্য এক বিরাট বাহিনী পাঠাইলেন, কিন্তু হিমালয় পর্বত পার হইতে গিয়া প্রায় সমস্ত সৈন্য মারা পড়িল।

বিজয় অভিযান

সুলতানের এই সকল খেয়ালের ফলে প্রজাদের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি হইল এবং রাজ্যের নানাস্থানে বিদ্রোহ দেখা দিল। বঙ্গদেশ স্বাধীন হইল। দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর ও বহ্‌মনী নামে দুইটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হইল। গুজরাট, মালব ও সিন্ধুদেশে বিদ্রোহ শুরু হইল, সুলতান নিজে বিদ্রোহ দমন করিতে গেলেন। অবশেষে সিন্ধুদেশে ১৩৫১ খ্রীষ্টাব্দে অসুস্থ হইয়া সুলতান মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

খেয়ালের ফল

মহম্মদ-বিন্‌-তুঘলকের পরবর্তী সুলতান ফিরুজ শাহ্‌ তুঘলকের সামরিক প্রতিভা ছিল না, কিন্তু তিনি শাসন সংস্কারের ক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। প্রজাবর্গের স্বার্থে তিনি রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস করেন। নানারকম বাড়তি করের অবসান ঘটাইয়া তিনি কোরান-নির্দিষ্ট চারিপ্রকার কর ধার্য করেন। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁহার প্রয়াস, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি জনহিতকর কার্য তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু তিনি ছিলেন ধর্মান্ধ। সুলতানী সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার মত যোগ্যতা তাঁহার ছিল না। ফলে তাঁহার মৃত্যুর (১৩৮৮ খ্রীঃ) পর তুঘলকবংশের পতনের সূচনা হইয়াছিল। অতঃপর ঐ বংশের শেষ সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ শাহের আমলে দিগ্বিজয়ী বীর তৈমুরলঙ্গ ভারত আক্রমণ করেন।

ফিরুজ শাহ্‌

তুঘলকবংশের পতনের পর সৈয়দ (১৪১৪-১৪৫১ খ্রীঃ) ও লোদী (১৪৫১-১৫২৬ খ্রীঃ)-বংশের সুলতানগণ রাজত্ব করেন। লোদীবংশের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে মোগল নেতা বাবর ভারত আক্রমণ করেন। অতঃপর ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীর পতন ঘটিলে দিল্লী সুলতানীর পতন ঘটে।

দিল্লী সুলতানীর পতন

শাসনব্যবস্থা ঃ সুলতানী আমলে ভারতে স্বেচ্ছাচারী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুলতানের অধীনে অনেক উচ্চ-রাজকর্মচারীরা থাকিতেন বটে, কিন্তু সুলতান তাঁহাদের মতামত লইয়া কাজ করিতে বাধ্য ছিলেন না।

সামরিক শক্তির বলেই দেশে শান্তি ও শৃংখলা রক্ষিত হইত। রাজধানী ও প্রধান প্রধান দুর্গে সৈন্য মোতায়েন করিয়া রাখা হইত। সুলতান অত্যাচারী হইলে হিন্দুদের দুর্দশার অবধি থাকিত না।

স্বেচ্ছাচারতন্ত্র

সুলতানী শাসনব্যবস্থাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা চলে—যথা, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক। কেন্দ্রে অসামরিক শাসনব্যবস্থার প্রধান ছিলেন উজীর বা প্রধানমন্ত্রী। তবে তাঁহার উপরে ছিলেন স্বয়ং সুলতান। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় সুলতানের অনুরূপ ভূমিকা পালন করিতেন।

কটোয়াল নামধারী এক শ্রেণীর কর্মচারী অভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। দণ্ডবিধি কঠোর ছিল। মুসলমানদের নিকট হইতে ধর্মীয় কর বা জাকৎ আদায় করা হইত, হিন্দুদের জিজিয়া কর দিতে হইত।

সামাজিক অবস্থা ঃ ইবন বতুতা নামক সুবিখ্যাত মরক্কোদেশীয় পর্যটক সুলতান মহম্মদ তুঘলকের আমলে ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি চতুর্দশ শতাব্দীতে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, সুলতানের কঠোর শাসনে শেখ ও মৌলবীদেরও দুষ্কর্মের জন্য উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হইত। সমাজে বহু ক্রীতদাস ছিল। হিন্দুরা খুব অতিথিপরায়ণ ছিল। সতীদাহপ্রথা প্রচলিত ছিল।

সুলতানী যুগে হিন্দু সমাজের রক্ষনশীলতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কারণ হিন্দু সমাজে জাতিভেদের কঠোরতার ফলে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের নানা সামাজিক অসুবিধা ভোগ করিতে হইত, অথচ মুসলমান সমাজে জাতিবৈষম্য ছিল না, তাই হিন্দুরা ধর্মান্তরিত হইয়া মুসলমান হইলেই সামাজিক বৈষম্য কাটিয়া যাইত। এমতাবস্থায় বহু হিন্দু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এই সঙ্কটময় সময়ে মুসলমান প্রভাব হইতে হিন্দুধর্ম ও সমাজ রক্ষা করিবার জন্য বাংলা দেশে স্মার্ত রঘুনন্দন, বিজয়নগরের বা দাক্ষিণাত্যের মাধবাচার্য প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ কঠোর ধর্মসংক্রান্ত ও সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিলেন। বর্ণপ্রথা কঠোর হইল এবং হিন্দু বালিকাদের বাল্যকালে বিবাহ দিবার রীতি চালু হইল। পর্দা-প্রথার বহুল ব্যবহার দেখা দিল।

হিন্দু সমাজে রক্ষণশীলতা বৃদ্ধি

অর্থ নৈতিক অবস্থা ঃ সুলতানী আমলে দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন হয় নাই এবং রাজস্বনীতির ক্ষেত্রেও চিরাচরিত ধারাই অনুসৃত হইত। এমন কি, রাজস্ব বিভাগে হিন্দুদেরই প্রাধান্য ছিল। হিন্দুরাই ছিল হিসাবরক্ষক।

কৃষিই ছিল সুলতানী যুগের প্রধান উপজীবিকা। জমিতে প্রচুর খাদ্যোৎপাদন হইত। সেই কারণে খাদ্যদ্রব্যের দাম ছিল সস্তা এবং খাদ্য রপ্তানিও হইত। কিন্তু কৃষকদের আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না। তাহাদের অনেক করের বোঝা বহন করিতে হইত।

শ্রমশিল্পের উন্নতির জন্য সরকার হইতে সাহায্য করা হইত। সরকারী কারখানায় ৪০০০ তাঁতী রেশমের নানাপ্রকার কাপড় বুনিত এবং বিদেশের সহিতও প্রচুর বাণিজ্য চলিত। ব্রোচ ও কালিকট বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে বণিকেরা আসিয়া সেখানে কেনাবেচা করিত।

সমন্বয় ও সৌহার্দ্য ঃ হিন্দু ও তুর্কীদের মিলনের পথে কতকগুলি অন্তরায় ছিল। বিজেতা ও বিজিতগণের মধ্যে স্বভাবতঃই একটি বৈরভাবের সঞ্চার হয়, তাহার উপর হিন্দুধর্ম ও সমাজবিধি এবং ইসলাম ধর্ম ও সমাজবিধির মধ্যে যথেষ্ট মৌলিক পার্থক্য ছিল। এই পার্থক্যগুলিই উভয় জাতির মিলনের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। হিন্দুশাস্ত্রের বিধানানুযায়ী হিন্দুগণ তুর্কীদিগের সহিত পানভোজনে যোগ দিতে পারিত না এবং আচার-ব্যবহার ও খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে উভয় জাতি সম্পূর্ণ ভিন্ন মতাবলম্বী ছিল।

কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই বৈরভাব অনেক পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া আসিল। ইতিমধ্যে অনেক হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, অনেক মুসলমান হিন্দুরমণী বিবাহ করিয়াছিল এবং এইরূপে উভয় জাতির সংমিশ্রণ আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই উপলব্ধি করিতেছিল যে, তাহারা একই দেশের অধিবাসী এবং একই সুখ-দুঃখের সমান অংশভাগী। মুসলমান বিজেতৃগণ ইহাও বুঝিতেছিলেন যে, সমগ্র ভারতকে কখনও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা যাইবে না। সুতরাং চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই মুসলমান সুলতানগণ হিন্দুদের প্রতি বিশেষ অত্যাচার করিতেন না, বরং তাহাদিগকে বহুল পরিমাণে রাজকার্যে নিযুক্ত করিতেন।

মিলনের ধারা ঃ কালক্রমে একত্র বসবাসের ফলে হিন্দু ও মুসলমানগণ পরস্পরের আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রভাবিত হইতে লাগিল। বহু হিন্দুসন্তান বিজেতা মুসলমানদের আদব-কায়দা অনুকরণ করিত। তাহারা মুসলমানী পোশাক পরিত। যে-সকল হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত, তাহাদের চিত্তে হিন্দুভাব প্রবল থাকিত এবং তাহারা হিন্দু আচার-ব্যবহার পালন করিত। হিন্দুরা যেমন সাধু-পুরুষদের পূজা করে, মুসলমানরাও সেইরূপ পীর সাহেবদের পূজা আরম্ভ করিল। হিন্দুরাও সত্যপীরের পূজা করিতে লাগিল।

শিল্প ও স্থাপত্যের বিকাশ ঃ তুর্কী সুলতানগণ বাগদাদ শহরে প্রচলিত স্থাপত্যরীতির অনুকরণে ভারতে মসজিদ, মিনার প্রভৃতি নির্মাণে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু ভারতীয় স্থপতি ও শিল্পিগণ হিন্দু স্থাপত্যরীতিতেই অধিক পারদর্শী ছিল। সুতরাং উহাদের দ্বারা যে-সকল মসজিদ, মিনার বা সমাধিস্তম্ভ নির্মিত হইল, তাহাতে হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্য-বিদ্যার একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। দিল্লীর কুতুব মিনার ও আলাই দরওয়াজা, আজমীরের আড়াই-দিন-কি ঝোপড়া, আহ্‌মদাবাদের জামী মসজিদ প্রভৃতি সৌধাবলী হিন্দু-মুসলমান স্থাপত্য-কৌশলের পরিচয় প্রদান করে।

উর্দূ ভাষার উৎপত্তি—
ফারসী ভাষার উন্নতি—
সাহিত্য-ইতিহাস

ভাষা ও সাহিত্য ঃ সুলতানী যুগে হিন্দী ভাষার সহিত ফারসী ও আরবী ভাষার শব্দসম্ভারের মিলনে উর্দূ নামে একটি নূতন ভাষার সৃষ্টি হয়। ইহা ছাড়া দিল্লীর সুলতানগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ফারসী সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। আমীর খসরু এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। এই সময়ে ফারসী ভাষায় কয়েকখানি উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হয়। মিনহাজউদ্দীন, জিয়াউদ্দীন বরণী, আফিফ্ প্রভৃতি লেখকগণের গ্রন্থ এই যুগের নির্ভরযোগ্য ইতিবৃত্ত বলিয়া বিবেচিত হয়।

সুলতানী যুগে লোকসাহিত্যের বিকাশ হইয়াছিল। ইহা ছাড়া বৈষ্ণব কবিগণের চেষ্টায় বাংলা ভাষার অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে বাংলার কবি চণ্ডীদাস ও মিথিলার কবি বিদ্যাপতির নাম উল্লেখযোগ্য।

এই সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কয়েকজন মুসলমান শাসক হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করিতেন। বাংলার সুলতান হোসেন শাহ

হিন্দু শাস্ত্র অনুবাদে উৎসাহ দিতেন। তাঁহার কর্মচার মালাধর বসু ভাগবত অনুবাদ করেন। কাশ্মীরের সুলতান জৈনুল আবেদীন (১৪২৩-১৪৭০ খ্রীঃ) তাঁহার উদার ধর্মমতের জন্য 'কাশ্মীরের আকবর' উপাধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার উৎসাহে মহাভারত ও কলহনের রাজতরঙ্গিণী ফারসী ভাষায় অনূদিত হয় এবং বহু আরবী ও ফারসী গ্রন্থ হিন্দীতে অনূদিত হয়। তিনি রাজকার্যে বহু হিন্দু কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

অনুবাদ-সাহিত্য

ভক্তিবাদ ঃ হিন্দু ভক্তিবাদ এবং মুসলমান সুফী মত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। সুলতানী আমলে কতিপয় হিন্দুধর্ম-সংস্কারক উদার সরল ভক্তিবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল প্রচারকের মধ্যে চৈতন্য, কবীর ও নানক সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহারা সকলেই সাধারণ লোকের নিকট আঞ্চলিক মাতৃভাষায় ভক্তিধর্ম প্রচার করিতেন। ইহাদের ধর্মের মধ্যে কোন গভীর দার্শনিক মতবাদ ছিল না। সর্বোপরি এই ধর্মের মূলকথা ছিল, "ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়; তিনি হিন্দুরও ঈশ্বর, মুসলমানেরও ঈশ্বর। তিনি সকলেরই আরাধ্য। জীব মাত্রই ভগবানের সন্তান। ভজন, ভক্তি ও সেবার দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায়। আচার-অনুষ্ঠান, যাগ-যজ্ঞাদি মানুষকে যথার্থ মুক্তি দিতে পারে না।" এই সরল সত্য প্রচারের ফলে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে বিরোধ কমিয়া গিয়াছিল।

কবীর ঃ কবীর পঞ্চদশ শতাব্দীর কোন এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। সুফী, যোগী, বৈদান্তিক প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হইয়াছিলেন। ফলে হিন্দু, ইসলাম কোন ধর্মেরই বাহিরের আচার-ব্যবহার তিনি মানিতেন না। এইভাবে তিনি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় সমন্বয়ের চেষ্টা করেন। সরল সহজ কথায় তিনি ভক্তিরস বিতরণ করিতেন। তাঁহার প্রধান পরিচয় তিনি

ধর্মীয় সমন্বয় সাধন



কবীর

ভক্ত। কোন বিশেষ সম্প্রদায়ে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বলিতেন, "ঈশ্বর এক, হিন্দুরা যাঁহাকে বলে রাম, মুসলমানেরা তাঁহাকেই বলে আল্লাহ্"—তাঁহার মতে পবিত্রভাবে জীবন ধারণ করিয়া যে সন্ত এক ঈশ্বরের আরাধনা করে সেই সন্তই বুদ্ধিমান।

হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই কবীরকে সমান ভক্তি করিত, তবে সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের মধ্যেই তাঁহার বাণী বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছে। কবীরের শিষ্য সম্প্রদায় কবীরপন্থী নামে পরিচিত। কবীর হিন্দী ভাষায় ধর্ম প্রচার করিতেন এবং ঐ ভাষায় তিনি অনেক "দোঁহা" রচনা করিয়াছিলেন। সেগুলির ভাষা ও ভাব অতি সুন্দর।

চৈতন্যদেব : ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে চৈতন্যদেবের জন্ম হয়। তাঁহার পূর্বনাম বিশ্বম্ভর এবং ডাকনাম ছিল নিমাই। ছাত্র হিসাবে তিনি অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। ফলে অতি অল্পবয়সে সাহিত্য, ন্যায়, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়া তিনি নবদ্বীপে টোল খুলিয়া বসেন। ক্রমে পণ্ডিত হিসাবে তাঁহার খ্যাতি চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করে। কিন্তু ক্রমশ বৈরাগ্যের প্রতি আসক্তির ফলে চব্বিশ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া তিনি কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন।

প্রথম জীবন



চৈতন্যদেব

সন্ন্যাস গ্রহণের পর বেশীর

ভাগ সময়ই চৈতন্যদেব নীলাচলে বা পুরীতে অতিবাহিত করেন। বাংলায় ধর্মপ্রচার শেষ করিয়া উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহু তীর্থস্থান দর্শন করেন। হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান কাশী ও বৃন্দাবনেও তিনি কিছু-কাল অতিবাহিত করেন। ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র আটচল্লিশ বৎসর বয়সে পুরীতে তাঁহার তিরোধান ঘটে।

তীর্থ পর্যটন ও বৈষ্ণবধর্ম প্রচার

চৈতন্যদেব প্রবর্তিত ধর্ম 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম' নামে প্রসিদ্ধ। তিনি নিজে কোন গ্রন্থ রচনা করিয়া এই নূতন ধর্ম ব্যাখ্যা করেন নাই। তৎকালীন বৃন্দাবনবাসী ছয়জন গোস্বামী শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করিয়া "গৌড়ীয় বৈষ্ণব" মতকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। ইহাদের মধ্যে রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামীর নাম খুবই পরিচিত। ঈশ্বরে প্রেম এবং জীবের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন ইহাই বৈষ্ণবধর্মের মূল কথা। এই প্রেম আস্বাদনের সহজ উপায় নির্ধারণের জন্য চৈতন্যদেব স্বয়ং হরিনাম সংকীর্তনের প্রচলন করেন। নিত্যানন্দ প্রভৃতি শিষ্যগণ তাঁহার ভক্তি ও প্রেমে মুগ্ধ হন। চৈতন্যদেব জাতিভেদ-প্রথা মানিতেন না। বৈষ্ণব ভক্তগণ সকলে একজাতীয়; তাঁহাদের মধ্যে জাতিবিচার নাই। যবন হরিদাস তাঁহার অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম

নানক ঃ শিখধর্মের প্রবর্তক ও সংগঠক গুরু নানক লাহোরের নিকটবর্তী তালবন্দী গ্রামে এক ক্ষত্রীবংশে জন্মগ্রহণ করেন। সত্যের সন্ধানে তিনি সুদূর মক্কা ও বাগদাদ পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তৎকালীন ধর্মীয় বিবাদ ও অসন্তোষ তাঁহার মনে গভীর রেখাপাত করে। হিন্দু ও ইসলাম উভয় ধর্মের অর্থহীন কুসংস্কার ও আচার-অনুষ্ঠান তিনি বর্জন করিতে নির্দেশ দেন। নানকের বাণী 'আদি গ্রন্থ' নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কবীরের ন্যায় নানক ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাস করিতেন, মূর্তিপূজার নিন্দা

ধর্মমত



নানক

করিতেন। তিনি জাতিভেদ মানিতেন না এবং হিন্দু ও মুসলমান একই পরমেশ্বরের সৃষ্টি একথা তিনি দৃঢ়ভাবে প্রচার করেন। প্রতারণা, স্বার্থপরতা, অসত্য এবং পার্থিব আসক্তি ত্যাগ করিয়া সত্যস্বরূপ ভগবানের আরাধনাই একমাত্র মুক্তির পথ—এই ছিল তাঁহার ধর্মমত। তিনি বলিতেন ধর্মপালনের জন্য সদ্‌গুরুর আশ্রয় লইতে হইবে এবং গুরু যে পথ বলিয়া দিবেন, সেই পথে চলিতে হইবে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। তবে নানকের শিষ্যগণের অধিকাংশ ছিল অশিক্ষিত জাঠ-কৃষক, তাহারা আপনাদিগকে শিখ বা গুরুর শিষ্য বলিত।

সুলতানী আমলে বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃতি

সূচনাঃ সুলতানী আমলে বাংলায় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ হইয়াছিল। বাংলার শাসক ইলিয়াস শাহের আমল হইতেই পণ্ডিত ও কবিগণ রাজদরবারে সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জন করিতে থাকেন। মধ্যযুগে সংস্কৃত সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ইহা ছাড়া এই সময়ে বাংলা সাহিত্যেরও গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে বাংলার শাসক বারবক শাহের উৎসাহে মালাধর বসু নামক জনৈক কবি "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" কাব্য রচনা করেন। এদিকে ঐ শতাব্দীতে কৃত্তিবাস ওঝা রামায়ণের অনুকরণে বাংলায় রামায়ণ রচনা করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের আবির্ভাবও ছিল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এগুলির মধ্যে চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও মনসামঙ্গল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে চণ্ডীমঙ্গলের রচয়িতা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের নাম স্মরণীয়।

মধ্যযুগে বাংলায় বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রসার হইয়াছিল। বৈষ্ণব কবিদিগের ভিতর প্রধানত চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির নাম উল্লেখযোগ্য। চণ্ডীদাস ছিলেন বাঙ্গালী, কিন্তু বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার অধিবাসী। তাঁহাদের কাব্যে ব্যবহৃত ভাষা ব্রজবুলি নামে পরিচিত। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর বাংলা সাহিত্যে এক নূতন ধারার সংযোজন হয়। চৈতন্যদেবের জীবন ও লীলা—

ইহাই ছিল ঐ সাহিত্যের প্রধান বিষয়। এই বিষয় লইয়া কৃষ্ণদেব কবিরাজ 'চৈতন্য-চরিতামৃত' রচনা করিয়া আজিও অমর হইয়া আছেন।

সামাজিক ও ধর্মীয় অব্যবস্থা ঃ ইসলামীয় সভ্যতার প্রভাবে মধ্যযুগে বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে বহু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। জাতিভেদ-প্রথার কঠোরতা বৃদ্ধি পায় এবং উচ্চ বর্ণের লোকদের প্রাধান্য সমাজের সচলতা বিনষ্ট করিয়াছিল। কিন্তু এই সময়ে ভারতের সর্বত্র ভক্তি আন্দোলন শুরু হইয়াছিল। এই আন্দোলনের মূল কথাই ছিল ভক্তি, অর্থাৎ আচার বিচার বা পূজা-পদ্ধতির জটিলতা ত্যাগ করিয়া ভক্তির উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপিত হইল। এই আন্দোলনের ফলে প্রতিষ্ঠিত ধর্মের গোঁড়ামির মূলে আঘাত পড়িয়াছিল। হুসেন শাহের আমলে চৈতন্যদেব বাংলায় ভক্তি-ধর্ম প্রচার করেন। তিনি হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সকলের মধ্যেই তাঁহার প্রেমের বাণী ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। ফলে উচ্চ-নীচ বর্ণের ভেদ সম্বন্ধে সামাজিক কঠোরতা পূর্বাপেক্ষা শিথিল হইয়াছিল।

অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ সুলতানী যুগে বঙ্গদেশ ধনসম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। বিদেশী পর্যটক ইবন বতুতা বলিয়াছেন, তিনি পৃথিবীর অন্য কোথাও এই দেশের মত পণ্যের এত কম দাম দেখেন নাই। তদানীন্তন বঙ্গদেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যের খুব প্রচলন থাকিলেও কৃষিই ছিল জনসাধারণের উপজীব্য। চাউল ও জীবনযাপনের পক্ষে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কল্পনাতীত প্রাচুর্য ছিল। বস্ত্র-শিল্প খুবই উন্নত ছিল এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য হইতেও প্রচুর ধনাগম হইত। কিন্তু এত প্রাচুর্যের মধ্যেও হিন্দুদের জীবন সুখের ছিল না। তাহাদিগকে উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক রাজস্ব এবং আরও অনেক কর দিতে হইত।

প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক ঃ

১। কিভাবে তুর্ক আফগানগণ বিভিন্ন অভিযানের মাধ্যমে ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন?

২। কিভাবে দিল্লীকে কেন্দ্র করিয়া সুলতানী শাসনের সূচনা হইয়াছিল?

৩। দাসবংশের তিনজন উল্লেখযোগ্য সুলতান সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৪। মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের কার্যাবলীর বিবরণ দাও।

৫। সুলতানী আমলের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

৬। সুলতানী আমলের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখ।

৭। "ভক্তিবাদ" বলিতে কি বুঝ? ভক্তি-আন্দোলনের সহিত জড়িত তিনজন ধর্ম-প্রচারকের ধর্ম প্রচার সম্পর্কে আলোচনা কর।

৮। সুলতানী আমলে বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক ঃ

(ক) দিল্লীর সুলতানী শাসনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? তিনি শাসন-ব্যবস্থা দৃঢ় করিবার জন্য কি করিয়াছিলেন? (খ) আলাউদ্দিন কে ছিলেন? তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তার সম্পর্কে কি জান? (গ) কোন্ সুলতানকে 'পাগলা রাজা' বলিয়া অভিহিত করা হয়? কি কারণে তিনি ব্যর্থ হইয়াছিলেন? (ঘ) বলবন কে ছিলেন? দিল্লীর সুলতানী শাসনের মর্যাদা বৃদ্ধিকল্পে তিনি কি করিয়াছিলেন? (ঙ) সুলতানা শাসনব্যবস্থার স্বরূপ ও প্রকৃতি কি ছিল? (চ) সুলতানী আমলে স্থাপত্যের কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল? (ছ) সুলতানী আমল ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে কতদূর উন্নত ছিল? (জ) দিল্লীর মহিলা সুলতান কে ছিলেন? কি কারণে তাঁহার পতন হইয়াছিল? (ঝ) ফিরুজ শাহ কোন্ বংশের সুলতান ছিলেন? প্রজাদের উন্নতির জন্য তিনি কি করিয়াছিলেন? (ঞ) চৈতন্যদেব কে ছিলেন? কিভাবে তাঁহার ধর্মমত প্রচারিত হইয়াছিল? (ট) সুলতানী আমলে অনুবাদ সাহিত্যের কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল? (ঠ) সুলতানী আমলে ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? (ড) গুরু নানকের ধর্মমত কি ছিল?

এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(১) সুলতান মাহ্‌মুদ কোন্ রাজ্যের সুলতান ছিলেন? তিনি কতবার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন? (২) মুহম্মদ ঘোরী কে ছিলেন? ভারতীয় কোন্ নৃপতির সহিত যুদ্ধে তিনি প্রথমবার পরাস্ত হইয়াছিলেন? (৩) দিল্লীর প্রথম স্বাধীন সুলতান কে ছিলেন? (৪) ইলতুৎমিস কাহাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন? (৫) বলবনের রাজত্বকালে কোন্ বিদেশী শক্তি ভারত আক্রমণ করিয়াছিল? (৬) খলজী বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান কে? (৭) কোন্ সুলতানকে

"পাগলা রাজা" বলা হইত ? (৮) কোন্ সুলতান তামার নোট প্রচলন করিয়াছিলেন ? (৯) লোদী বংশের শেষ সুলতান কে ছিলেন ? (১০) সুলতানী যুগে কোন্ নূতন ভাষার জন্ম হইয়াছিল ? (১১) সুলতানা আমলে ভারতে কোন্ স্থাপত্যরীতি প্রচলিত হইয়াছিল ? (১২) কৃত্তিবাস ওঝা কে ছিলেন ?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(১) সুলতান মাহ্মুদ — সুলতান ছিলেন এবং তিনি — বার ভারত আক্রমণ করেন ; (২) মুহম্মদ ঘোরী — দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজকে পরাস্ত করিয়া দিল্লী ও — দখল করেন ; (৩) — ছিলেন দিল্লীর প্রথম স্বাধীন সুলতান ; (৪) দাসবংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন — ; (৫) খলজিবংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন — ; (৬) সুলতান — দিল্লী হইতে দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তর করেন ; (৭) সুলতানী আমলে — নামে একটি নূতন ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল ; (৮) কবির — ভাষায় অনেক — রচনা করিয়াছিলেন ; (৯) চব্বিশ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া — কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন ; (১০) চৈতন্যদেব প্রবর্তিত ধর্ম — নামে প্রসিদ্ধ ; (১১) নানকের শিষ্যগণ আপনাদিগকে — বা গুরুর শিষ্য বলিত ; (১২) মধ্যযুগে বৈষ্ণব কবিদিগের ভিতর প্রধানত — ও — নাম উল্লেখযোগ্য ; (১৩) — শাহের আমলে চৈতন্যদেব বাংলায় ভক্তিধর্ম প্রচার করেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

মধ্যযুগের রূপান্তর

কনস্টান্টিনোপলের পতন ঃ ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট একাদশ কনস্টানটাইন রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের রাজপথে তুর্কীদের সহিত যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন। এই ঘটনা ইতিহাসে কনস্টান্টিনোপলের পতন নামে অভিহিত।

ইওরোপের ইতিহাসে কনস্টান্টিনোপলের পতন নিঃসন্দেহে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কারণ কনস্টান্টিনোপল ছিল গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির আবাসস্থল। তাই কনস্টান্টিনোপলের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে বসবাসকারী গ্রীক পণ্ডিতগণ বহু মূল্যবান পুঁথিপত্রসহ ইওরোপের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়েন। এক্ষণে ঐ সকল পণ্ডিতগণের চেষ্টায় বহু লুপ্তপ্রায় গ্রীক ও রোমান সাহিত্য, দর্শন, শিল্প প্রভৃতির পুনরুদ্ধার হয়। স্বভাবতই কনস্টান্টিনোপলের পতন ইওরোপে নব-জাগরণ বা রেনেসাঁসের উন্মেষে সহায়তা করিয়াছিল।

পতনের গুরুত্ব

সাধারণত কনস্টান্টিনোপলের পতনের দিন হইতে নবযুগের সূচনা ধরা হইয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এই যুগ পরিবর্তন একদিনে ঘটে নাই, বহুকাল ধরিয়া আস্তে আস্তে ঘটিয়াছিল, মধ্যযুগের শেষের দিকে ইওরোপ এক অবস্থায় স্থিরভাবে ছিল না, ক্রমশ উন্নতির দিকে আগাইতেছিল। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমশ বিকাশ হইতেছিল। বিদ্যাচর্চার জন্য ইওরোপের বিভিন্ন স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছিল। এইভাবে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে নব-জাগরণ দেখা দিতেছিল।

নবযুগের সূচনা

নব-জাগরণের বৈশিষ্ট্য ঃ নব-জাগরণ কথাটির অর্থ হইতেছে নূতন জীবন বা পুনর্জন্ম। মধ্যযুগের গতানুগতিক চিন্তাধারা, ধর্মের বাধানিষেধ ও কুসংস্কার সমাজের বুকে চাপিয়া বসিয়াছিল। মানুষ তাহার নিজের পথে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে ও চলিতে পারিত না। মধ্যযুগের এই আড়ষ্ট অচল অবস্থা হইতে নব-জাগরণ মানুষের মনকে মুক্তি দিয়াছিল। ফলে প্রচলিত বিধি-বিধানকে লঙ্ঘন করিবার মত চিন্তার সাহস দেখা দিতে আরম্ভ করে। যুক্তি-তর্কের দ্বারা সকল কিছুরই মূল্যায়ন শুরু হইল। সব বিষয়ে মানুষ তখন নিজে অনুসন্ধান করিয়া সত্যে পৌঁছিতে চাহিল।

স্বাধীন চিন্তার বিকাশ

নব-জাগরণের অন্যতম বিশেষত্ব ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার। নব-জাগরণে নূতন সাহিত্য, নূতন শিল্পকলা ও নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্ম হইল। কিন্তু

নব-জাগরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্য ও শিল্পকলার নূতন অভ্যুত্থান। ফলে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান পুঁথিপত্র খুঁজিয়া বাহির করা হইতে লাগিল এবং প্রাচীন পুস্তকাদি লোকে সযত্নে পড়িতে লাগিল।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার

মধ্যযুগে সাহিত্য ও শিল্পের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ব ও সাধুসন্তদের মূর্তিগঠন ও চিত্রাঙ্কন। এই ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপার বাদ দিয়া মানবতা এবং মানুষের সম্বন্ধে এখন নূতন করিয়া আলোচনা আরম্ভ হইল। আধ্যাত্মিক কথা ছাড়িয়া সৌন্দর্য-চর্চার জন্য সাহিত্য ও শিল্পের সৃষ্টি হইল। এইভাবে সাহিত্যে ক্রমশ মানবতাবাদের আবির্ভাব ঘটিল। এই প্রসঙ্গে ইতালীয় মানবতাবাদীদের ভিতর

মানবতাবাদের আবির্ভাব



পেত্রার্ক



লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি

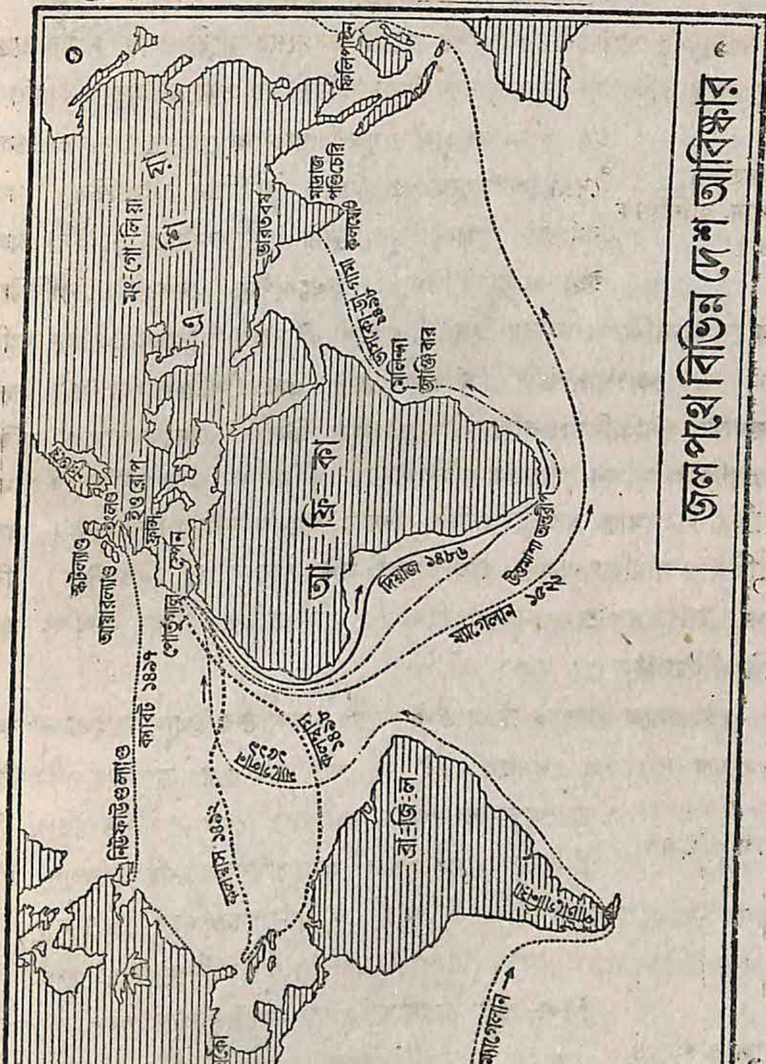
সাহিত্যে পেত্রার্ক ও বোকাচো এবং চিত্রাঙ্কনে ও ভাস্কর্যে র‍্যাফেল, মাইকেল এঞ্জেলো ও লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও নব-জাগরণ দেখা দিল। মানুষ জড়জগতের প্রাকৃতিক নিয়মগুলি বুঝিতে শিখিয়া প্রকৃতির উপর প্রভুত্বের সূত্রপাত করিল। আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার বিকাশ হইল। আগে টলেমী নামক মিশরের এক গ্রীক পণ্ডিত প্রচার করিয়াছিলেন যে, পৃথিবী স্থির হইয়া আছে, আর সূর্য ও নক্ষত্রগুলি পৃথিবীর চারিধারে ঘুরিতেছে। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কোপারনিকাস প্রমাণ করিলেন যে, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। অতঃপর ইতালীয় পণ্ডিত গ্যালিলিও ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে এক শক্তিশালী দূরবীন আবিষ্কার করিয়া তাহার সাহায্যে নক্ষত্রমণ্ডলী সম্বন্ধে নূতন নূতন সত্য বাহির করিলেন। ইহা ছাড়া তিনিই ছিলেন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের উদ্ভাবক। রসায়নশাস্ত্র আরম্ভ হইল অক্সফোর্ডের রবার্ট বয়েলের (১৬২৭-১৬৯১ খ্রীষ্টাব্দে) কাজের মধ্যে। উইলিয়ম হার্ভে নামক আর এক ইংরাজ শরীরের ভিতর রক্ত সঞ্চালনের নিয়ম বাহির করিলেন।

বৈজ্ঞানিক উন্মেষ

ভৌগোলিক আবিষ্কার : নব-জাগরণে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এই সত্য জানিতে পারিল যে, পৃথিবীর আকৃতি গোলাকার। সেই সঙ্গে সমুদ্রে দিক্ নির্ণয় করিবার জন্য কম্পাস এবং পথ ঠিক করিবার জন্য মানচিত্র, নকশা ও অক্ষরেখা বাহির হইল। এই সকল নূতন নূতন আবিষ্কারের সাহায্যে নির্ভীক নাবিকেরা অজানা সমুদ্রের বিশাল বক্ষে পাড়ি দিতে সাহস করিল। ফলে নূতন নূতন বাণিজ্য-পথ ও দেশের সন্ধান পাওয়া গেল। এদিকে ইওরোপের যে রাজ্য যে নূতন দেশ আবিষ্কার করিল, সেটিকে সে নিজের বলিয়া দখল করিয়া লইল। এইভাবে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল পর্তুগালের অধীনে আসে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ স্পেনের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ক্রমে ক্রমে প্রাচ্য অঞ্চলে ইওরোপীয় শক্তির বিস্তার হইল। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলির মধ্যে কলহের সূত্রপাত হইল। সর্বোপরি সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইওরোপীয় সভ্যতা বিস্তারের চেষ্টা চলিতে লাগিল।

কম্পাস, নকশা, প্রভৃতি আবিষ্কার, নূতন দেশের সন্ধান—ফলাফল


জলপথে বিভিন্ন দেশ আবিষ্কার
দিয়াজ ১৪৮৬
ম্যাগেলান ১৫২২
কাবট ১৪৯৭
পোর্তুগাল
স্পেন
ভারতবর্ষ
ফিলিপাইন
ম্যাগেলান

জাতীয় রাষ্ট্রের উত্থান

মধ্যযুগের শেষের দিকে বিভিন্ন দেশের জনগণের মধ্যে আর সামন্ততন্ত্রের উপর আস্থা রহিল না। ক্রুসেডে যোগদান করিয়া বহু সামন্তের মৃত্যু হইয়াছিল। ইহা ছাড়া তৎকালীন যুদ্ধ-বিগ্রহে আগ্নেয়াস্ত্রের বহুল প্রচলন দেখা দিলে যুদ্ধের প্রকৃতিরও পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। ফলে বর্মাবৃত অশ্বারোহী বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা ফুরাইয়া গেল।

সামন্ততন্ত্রের অবসান, বাণিজ্যিক বিস্তার

ইহা ছাড়া ইতিমধ্যে ইওরোপীয় দেশগুলি বাণিজ্যিক বিস্তারে মনোনিবেশ করিয়াছিল। এক্ষণে ঐ সকল বাণিজ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট বড় বড় কোম্পানীগুলি জাতীয় রাষ্ট্র এবং শক্তিশালী ও সংহত রাজশক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে আগ্রহান্বিত ছিল। এদিকে সুযোগ বুঝিয়া রাজশক্তি ও আপন পরাক্রম বৃদ্ধির উপায় খুঁজিল। কারণ ইতিপূর্বে সামন্ত-তান্ত্রিক কাঠামোয় রাজার আর্থিক সাচ্ছল্য অনেক কমিয়া গিয়াছিল। বস্তুত আর্থিক ও সামরিক ক্ষেত্রে রাজা ছিল সামন্তদের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এক্ষণে বাণিজ্যকেন্দ্রিক নগরগুলিতে কর ধার্য করিয়া রাজার অর্থবল ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছিল।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের রাজশক্তির উত্থান উল্লেখ্য। কারণ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এই দুই দেশে রাজতন্ত্রের রূপান্তর ঘটিয়াছিল। ফ্রান্সে অবশ্য তখনও সামন্ততন্ত্র বেশ সুগঠিত ছিল, কিন্তু ইতিমধ্যে সেখানকার ক্যাপেসীয় বংশের রাজগণ দেশের প্রায় অর্ধেক ভূখণ্ডের উপর আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। ফলে রাজশক্তি বেশ প্রবল ছিল। ইংলণ্ডে রাজকীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা ভালই ছিল, কিন্তু এই ব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারগণ তখনও অনেকটা ক্ষমতা দখল করিয়াছিল। এমতাবস্থায় ইংলণ্ড ও ফ্রান্স উভয় দেশের রাজশক্তি পরিবর্তনের প্রথম পর্যায়ে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার আর্থিক ও সামরিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস করিতে উদ্যোগী হইয়াছিল। এইজন্য ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের রাজগণ নূতনভাবে রাজকর আদায়ের জন্য শুধুমাত্র প্রধান সামন্ত ও যাজকগণের উপর নির্ভর না করিয়া দেশের প্রতিনিধি সভার অধিবেশনে

ফ্রান্স ও ইংলণ্ড

ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে যথাক্রমে স্টেটস-জেনারেল ও পার্লামেন্টের উত্থান

ছোট বড় অনেক জমিদার ও শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রতিনিধিদেরও আহ্বান জানাইয়াছিলেন। ফলে সামন্তদের 'মহতী সভা'র স্থলে ফ্রান্সে স্টেটস-জেনারেল ও ইংলণ্ডে পার্লামেন্ট নূতন যুগের প্রতিনিধি সভা হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিল। ইহার ফলে ঐ দুই দেশে রাজশক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল এবং জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের পথ প্রশস্ত হইল।

পর্তুগাল ঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত ইওরোপের ইতিহাসে পর্তুগালের তেমন গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু ঐ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভৌগোলিক আবিষ্কারকে কেন্দ্র করিয়া রাজশক্তির মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পর্তুগাল রাজবংশের এক কুমার 'নাবিক হেনরী' নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি পর্তুগীজ নাবিকদিগকে প্রশিক্ষণ দিয়া আফ্রিকার উপকূল আবিষ্কার করিতে পাঠাইতেন। অতঃপর পর্তুগালের নাবিকগণ সমুদ্র-পথ আবিষ্কার করেন। ক্রমে ভারতের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এদিকে বিশ্বব্যাপী ভৌগোলিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে স্পেন পর্তুগালের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, ফলে বাণিজ্যিক স্বার্থ লইয়া স্পেনের সহিত বিবাদ শুরু হয়। তখন ধর্মগুরু পোপের মধ্যস্থতায় (১৪৯৩ খ্রীঃ) আফ্রিকা, ভারত, চীন, জাপান ও অন্যান্য প্রাচ্যদেশে পর্তুগালের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়।

নাবিক হেনরী—বাণিজ্যিক পথ আবিষ্কার

স্পেন ঃ ফ্রান্সের দক্ষিণে স্পেনের অবস্থান। ইওরোপের দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ আইবেরিয়ান উপদ্বীপের অধিকাংশ লইয়া এই রাজ্য গঠিত হইয়াছিল।

মধ্যযুগে ইসলাম ধর্ম প্রসারের সময় মুসলমানগণ স্পেন দখল করিয়াছিল। ইহার পর প্রায় আটশত বৎসর স্পেনে মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল। অতঃপর স্পেনের অন্তর্গত কতিপয় খ্রীষ্টান রাজ্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে এবং একাদশ শতাব্দীতে এই আন্দোলনে যথেষ্ট তীব্রতার সঞ্চার হইয়াছিল। এই আন্দোলনে খ্রীষ্টান রাজ্যগুলির মধ্যে ক্যাসটাইল ও এ্যারাগণ রাজ্যের রাজগণ প্রধান ভূমিকা লইয়াছিলেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ক্যাসটাইল রাজ্য স্পেনের মধ্যভাগ দখল করিয়াছিল। অতঃপর এ্যারাগণ রাজ্য সমগ্র পূর্ব স্পেনের উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু শীঘ্রই ক্যাসটাইল রাজ্যের রাণী ইসাবেলার সহিত এ্যারাগণ

রাজ্যের রাজা ফার্ডিন্যাণ্ডের বিবাহ হইলে ঐ দুই রাজ্য ঐক্যবদ্ধ হইল। ফলে এই ঐক্যবদ্ধ শক্তির সহিত যুদ্ধে স্পেনের মুসলমানদের পরাজয় ঘটে (১৪৯২ খ্রীঃ)। অতঃপর মুসলমানগণ স্বভাবতই স্পেন হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল। এইভাবে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে ফার্ডিন্যাণ্ডের রাজত্বকালে স্পেন ঐক্যবদ্ধ ও জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল। অতঃপর স্পেন সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতে ইওরোপে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাইলে ঐ আন্দোলন স্পেনের সাম্রাজ্যভুক্ত নেদারল্যাণ্ডে প্রসারিত হয়। অতঃপর স্পেনের সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের আমলে এই আন্দোলনের তীব্রতার সঞ্চার হইলে তিনি নেদারল্যাণ্ডে এক দারুণ সন্ত্রাস শুরু করেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করিতেছে দেখিয়া তাহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা হয়। এমতাবস্থায় বিদ্রোহিগণ নেদারল্যাণ্ডের উত্তরাঞ্চলের সাতটি প্রদেশ লইয়া হল্যাণ্ড রাজ্য গঠন করে। ইহার ফলে নেদারল্যাণ্ডের দক্ষিণভাগে বিদ্রোহ প্রশমিত হইলেও হল্যাণ্ডের বিদ্রোহীদের দমন করা সম্ভব হইল না। পরিশেষে ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে স্পেন হল্যাণ্ডের স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল এবং সেখানে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। হল্যাণ্ডের অধিবাসীদিগকে বলে ডাচ বা ওলন্দাজ। ফলে নূতন প্রজাতন্ত্রের নাম হইল 'ওলন্দাজ প্রজাতন্ত্র'।

ওলন্দাজ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

ইওরোপের বিস্তার ঃ ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে ইওরোপীয় দেশগুলি ইওরোপের বাহিরে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। ফলে সমুদ্রের পরপারে ইওরোপীয় শক্তির বিস্তার হইল। ইওরোপীয় বণিকেরা দলবদ্ধ হইয়া বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়া পড়িল। ফলে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে ইংরাজ, ওলন্দাজ ও ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সকল বানিজ্যিক সংস্থাগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট বণিকশ্রেণী বা বুর্জোয়া সম্প্রদায় ক্রমশ ইওরোপের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও অংশগ্রহণ করিতে শুরু করিল।

পুরাতন বনাম নূতন যুগ ঃ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক বিস্তারের ফলে ইওরোপে বণিকযুগের আবির্ভাব ঘটে। পূর্বে বণিক সম্প্রদায়

রাজশক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধিতে আগ্রহী ছিল। কিন্তু ইংলণ্ডের স্টুয়ার্ট রাজগণ বণিকদের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া পড়েন। ফলে রাজশক্তি ক্রমে বণিকশ্রেণীর স্বার্থে না গিয়া বাধাস্বরূপ হইয়া উঠিল। ইতিপূর্বে ইংলণ্ডে পার্লামেন্ট ছিল রাজারই আজ্ঞাবহ। কিন্তু এক্ষণে বণিকশ্রেণী ও ছোট ছোট ভূম্যধিকারিগণ সমাজে অধিকতর শক্তি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। তাই সপ্তদশ শতাব্দীতে স্টুয়ার্ট রাজগণের আমলে পার্লামেন্টের সহিত রাজশক্তির বিরোধ চরমে উঠিল। পরিশেষে গৃহযুদ্ধ বা রাষ্ট্রবিপ্লবের মাধ্যমে ইংলণ্ডে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের পতন হইল। এই সঙ্গে ইংলণ্ডে পুরাতন যুগের অবসান হইল এবং শাসনব্যবস্থায় পার্লামেন্ট তথা জনসাধারণের প্রাধান্য স্বীকৃত হইল।

ইংলণ্ডে গৃহযুদ্ধের সূচনা

প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক ঃ

১। কনস্টান্টিনোপলের পতন ও ঐ ঘটনার গুরুত্ব সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

২। নব-জাগরণের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখ।

৩। মধ্যযুগের রূপান্তর এবং জাতীয় রাষ্ট্রের উত্থান সম্পর্কে বিবরণ দাও।

৪। স্পেনে জাতীয় রাষ্ট্রের উত্থান এবং ওলন্দাজ প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক ঃ

(ক) কনস্টান্টিনোপলের পতনের পর কিভাবে নব-জাগরণের সূচনা হইয়াছিল? (খ) মানবতাবাদের আবির্ভাব বলিতে কি বুঝ? ইতালির একজন মানবতাবাদী সাহিত্যিক ও শিল্পীর নাম উল্লেখ কর। (গ) নব-জাগরণের আবির্ভাবে জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন ঘটিয়াছিল? বয়েল ও হার্ভের নাম কি জন্য বিখ্যাত? (ঘ) নব-জাগরণে বিজ্ঞানের অগ্রগতি কিভাবে ভৌগোলিক আবিষ্কার ত্বরান্বিত করিয়াছিল? (ঙ) মধ্যযুগের শেষভাগে কিভাবে রাজশক্তি ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল? (চ) কিভাবে স্পেনে ক্যাস্টাইল ও এ্যারাগণ রাজ্যদ্বয় ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল? (ছ) কি কারণে নেদারল্যাণ্ডে বিদ্রোহের সূচনা হইয়াছিল? ইহার ফলাফল কি হইয়াছিল? (জ) ইওরোপের বিস্তার বলিতে কি বুঝ? ইহার

ফলাফল সম্পর্কে কি জান? (ঝ) কিভাবে ইওরোপে বণিকযুগের আবির্ভাব হইয়াছিল? ইহার ফলে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল?

এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(১) কনস্টান্টিনোপলের শেষ সম্রাট কে ছিলেন? (২) নব-জাগরণ কথাটির অর্থ কি? (৩) কোপারনিকাস কে ছিলেন? (৪) গ্যালিলিও নক্ষত্রমণ্ডলী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য কি যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন? (৫) স্টেটস্-জেনারেল ও পার্লামেন্ট কোন্ কোন্ দেশের প্রতিনিধি সভা ছিল? (৬) নাবিক হেনরী কাহার নাম? (৭) ফার্ডিন্যাণ্ড কোথাকার রাজা ছিলেন? (৮) কোন্ সম্রাটের আমলে নেদারল্যাণ্ডের বিদ্রোহে তীব্রতার সঞ্চার হইয়াছিল? (৯) স্টুয়ার্টগণ কোথাকার রাজা ছিলেন? (১০) সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে কোন্ বংশ রাজত্ব করিত?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(১) কনস্টান্টিনোপল ছিল—সভ্যতা ও সংস্কৃতির আবাসস্থল; (২) নব-জাগরণের অর্থ হইতেছে —; (৩) মধ্যযুগে সাহিত্য ও শিল্পের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল —; (৪) — আবিষ্কারের ফলে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল — অধীনে আসে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের ফিলিপাইন — সাম্রাজ্যভুক্ত হয়; (৫) হল্যাণ্ডের অধিবাসীদিগকে বলে — বা —; (৬) — শতাব্দীতে — ইওরোপে বণিক যুগের আবির্ভাব ঘটে।

———